পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার ফলে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ভারতীয় শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মুনাফা ও বাজারের লোভে তারা ভারতবর্ষে একটি আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করার অপেক্ষায় বসেছিল। যে মুহূর্তে ভারতীয় শক্তিসমূহের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেই মুহূর্তেই তাদের আগ্রাসনমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরেজ শক্তি ভারতবর্ষকে একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কারণ তারা জানত যে ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তাদের সেখানে অবাধ অর্থনৈতিক লুণ্ঠন চালানো অনেক সহজ হবে, কূটনৈতিক দক্ষতা, সামরিক উৎকর্ষ এবং ভারতীয় শক্তিবর্গের অনৈক্যকে পুঁজি করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

৫.১ বাংলা

৫.১.১ সিরাজ উদ্‌দৌল্লা ও পলাশির যুদ্ধ

সমৃদ্ধিশালী ও সম্পদশালী বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল। ১৭১৭ সাল থেকে তৎকালীন মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ারের ফরমানের সুবাদে ইংরেজ কোম্পানি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা উপভোগ করত। এই ফরমান অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানি আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত পণ্যের ওপর কোনোরকম শুল্ক দিত না এবং এই পণ্য পরিবহনের জন্য কোম্পানি দস্তক প্রকাশ করার অধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো সুযোগসুবিধা এই ফরমান দেয়নি। ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে পণ্যসামগ্রী পরিবহনের সময় প্রায়ই দস্তকের অপব্যবহার করত। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে বাংলার নবাবদের সম্পর্কে তাই তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খান থেকে আলিবর্দি খান পর্যন্ত সমস্ত নবাবই দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোরতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর আগে আলিবর্দি খান তাঁর দৌহিত্র সিরাজ উদ্‌দৌল্লাকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করে যান। ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে আলিবর্দি খান মারা গেলে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হন সিরাজ উদ্‌দৌল্লা। কিন্তু সিরাজের সিংহাসন আরোহণ অনেককেই অসন্তুষ্ট করেছিল। আলিবর্দি খানের আর এক দৌহিত্র পূর্ণিয়ার ফৌজদার সৌকত জং

বাংলার মসনদ লাভ করার জন্য লালায়িত ছিলেন। সিরাজের এক মাসি ঘসেটি বেগমও বাংলার মসনদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ঘসেটি বেগম মুর্শিদাবাদের কাছে মতিঝিল অঞ্চলে থাকতেন। তিনি প্রচুর ধনসম্পদ এবং একটি সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। আলিবর্দি খানের প্রধান সেনাপতি বা 'বক্সি' মিরজাফরও সিরাজের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। সিংহাসনে আরোহণের পরেই সিরাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরাজ কখনোই তাঁর যুক্তিবিবর্জিত আবেগকে বর্জন করতে সচেষ্ট হননি। কাশিমবাজারের ফরাসি ফ্যাক্টরির তদানীন্তন প্রধান জাঁ ল (Jean Law)-এর লেখা থেকে জানা যায় যে লাম্পট্য এবং নিষ্ঠুরতা ছিল সিরাজের চরিত্রের দুটি উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

একই সঙ্গে বাংলার নবাব সিরাজ উদ্‌দৌল্লা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গেও বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক এস. সি. হিল (S. C. Hill) এই বিরোধের জন্য সিরাজ উদ্‌দৌল্লার অর্থলিপ্সা এবং ইংরেজদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার ইচ্ছাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু এই বক্তব্যের সমর্থনে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। সিরাজের সিংহাসন আরোহণের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই, ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজ কৃষ্ণদাসকে তার হাতে অর্পণ করার আবেদন জানিয়ে ইংরেজ কোম্পানিকে একটি চিঠি দেন। কৃষ্ণদাস ছিলেন ঢাকার জায়গিরদার রাজবল্লভের পুত্র। কৃষ্ণদাস সরকারি কোষাগার থেকে ৫৩ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজবল্লভ ছিলেন ঘসেটি বেগমের ঘনিষ্ঠ। তিনি তাঁর পুত্রকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে অনুরোধ করেছিলেন। সিরাজ উদ্‌দৌল্লা যে প্রথম থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, একথা সত্য নয়। তবে ইংরেজদের নানাবিধ কার্যকলাপ সিরাজকে ক্রমশ সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। সিরাজ অত্যন্ত সঠিকভাবেই সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন যে ইংরেজরা তাঁর দুই প্রতিপক্ষ সৌকত জং এবং ঘসেটি বেগমের সঙ্গে গোপন আঁতাত গড়ে তুলেছে। সৌকত জং-এর উপদেষ্টা গোলাম হোসেন খানের লেখা থেকে জানা যায় যে সৌকত জং তাঁর নবাব হবার প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সাহায্য পাবার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন।

সিরাজ তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঘসেটি বেগমের প্রচুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন। মিরজাফরকে 'বক্সি' পদ থেকে অপসারিত করা হল। পরিবর্তে সিরাজ তাঁর বিশ্বস্ত মিরমদনকে 'বক্সি' পদে নিয়োগ করলেন। আলিবর্দির সময়ের প্রভাবশালী রাজপুরুষদের অনেককেই বিতাড়িত করা হল। সিয়ের-উল-মুতাক্ষারিন-এর লেখক গোলাম হোসেন খানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে—এই সময় আলিবর্দির সময়ের সামরিক নেতা ও শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা সিরাজের ওপর প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নবাবের দেওয়ান রায় দুর্লভও নবাবের বিরুদ্ধে চলে যান এবং তিনি সম্ভবত পশ্চিম বাংলার জমিদারদের সিরাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে শুরু করেন। ১৭৫৭ সালের গোড়ার দিকেই বর্ধমান, নদিয়া ও বীরভূমের জমিদারেরা সিরাজ উদ্‌দৌল্লার বিরোধী হয়ে ওঠেন। সি. এ. বেইলি (C. A. Baily) বলেছেন যে—নবাব, বড়ো ব্যবসায়ী ও জমিদারদের

Scanned with CamScanner

কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায় করার জন্যই তাঁরা নবাবের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। অন্যান্য সুশীল চৌধুরী অবশ্য মনে করেন যে অভিজাত, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সিরাজের বলপূর্বক অর্থ আদায়ের সম্পর্কে সমসাময়িককালের ফার্সি কাহিনি ছাড়া কোনো প্রামাণ্য নথিপত্র পাওয়া যায় না। তবে একথা ঠিক যে সিরাজ সে যুগের বাংলার অত্যন্ত ধনী মহাজন জগৎ শেঠের কাছ থেকে পূর্ণিয়ার শৌকত জংকে দমন করার জন্য ৩০,০০০,০০০ টাকা দাবি করেছিলেন। তিনি এই টাকা দিতে অস্বীকার করলে নবাব তাঁকে আঘাত করেন। তারপর থেকেই জগৎশেঠেরা সিরাজের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিল।

১৭৫৭ সালের গোড়াতে দেখা গেল বাংলার অভিজাততন্ত্রের একটাই উদ্দেশ্য ছিল। তা হল—যেকোনোভাবেই হোক সিরাজকে বিতাড়িত করা। ইতিমধ্যে সিরাজ উদ্দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধিতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। সিরাজ কখনোই প্রথম থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করতে বা তাদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাননি। বরং ইংরেজদের ঔদ্ধত্যই সিরাজকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ইংরেজ বণিকেরা ১৭১৭ সালের ফরমান অনুযায়ী শুল্ক প্রদান করত। নবাব পদে অভিষিক্ত হবার পরই সিরাজ ইংরেজ বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের স্বার্থে দস্তকের অপব্যবহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। প্রথমে তিনি কোনো বাধা দেননি, কিন্তু তারপর নবাব দেখলেন যে ইংরেজ বণিকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য পণ্যের ওপর কোনো রকম শুল্ক তো নবাবকে দেনই না, উপরন্তু ভারতীয় পণ্য যখন তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন কলকাতায় প্রবেশ করতে লাগল, তখন সেইসব পণ্যের ওপর ইংরেজ কোম্পানি শুল্ক ধার্য করল। তার পর ইংরেজ কোম্পানির সহযোগিতায় এশিয়ান বণিকেরাও দস্তক অপব্যবহারের সুযোগ নিয়ে বাংলার নবাবকে বাণিজ্যশুল্ক ফাঁকি দিতে লাগলেন। ফলে সিরাজের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। সিরাজ যে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চাননি তা প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা একটি চিঠিতে। ১৭৫৬ সালের ২৮ মে খাজা ওয়াজিদকে পাঠানো একটি চিঠিতে সিরাজ লিখেছিলেন—ইংরেজরা যদি এদেশে থাকতে চায় তবে তাদের মুর্শিদকুলি খানের সময়ের যাবতীয় শর্ত মেনে নিয়ে বাংলাদেশে বাণিজ্য করতে হবে। তার ওপর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিরাজ উদ্দৌল্লার শত্রুদের মদত দিয়ে চলেছিল। ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেবার ঘটনাটি নবাবের কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। নবাব এবং ইংরেজ শক্তির মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠল যখন নবাব দেখলেন যে ইংরেজরা তাঁর কোনো অনুমতি ছাড়াই কলকাতায় একটি দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করেছে। সিরাজ অত্যন্ত সঠিকভাবেই এই ঘটনাকে তাঁর সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। এত ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সিরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথমেই সরাসরি সংঘাতে যেতে চাননি। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য নারায়ণ দাসকে কলকাতায় পাঠান। কলকাতার ইংরেজ কোম্পানির প্রধান রজার ড্রেক নারায়ণ দাসকে অপমান করলেন।

সিরাজ তৎক্ষণাৎ ইংরেজ শক্তিকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিরাজের সেনাবাহিনী কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করে। ইংরেজরা এই আক্রমণের জন্য

প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সিরাজের বাহিনী কাশিমবাজারে ইংরেজদের ওপর নির্বিচারে হত্যালীলা বা লুণ্ঠন কোনোটাই চালায়নি। ব্রিজিন গুপ্তকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে নবাবের কাছ থেকে ইংরেজরা 'উদার ও মানবিক' ব্যবহার পেয়েছিলেন। কেবল ওয়াটস এবং কোলেট—এই দুজনকে তিনি তাঁর সঙ্গ নিতে বাধ্য করেন এবং এই দুজনকে নিয়ে তিনি কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। সিরাজের বাহিনী সহজেই কলকাতার ইংরেজ শক্তিকে পরাস্ত করে ১৭৫৬ সালের ২০ জুন কলকাতা দখল করে নেয়। কলকাতার ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর ড্রেক ও তাঁর অনুচরেরা পালিয়ে গিয়ে কলকাতার দক্ষিণে ফলতা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সিরাজ উদ্দৌল্লা এবং ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এস. সি. হিল এই বিরোধের জন্য সিরাজের "ব্যক্তিগত অহংকার এবং অর্থলিপ্সা" (personal vanity and avarice)-কে দায়ী করেছেন। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক পিটার মার্শাল (Peter Marshall) তাঁর *Bengal : The British Bridgehead* গ্রন্থে প্রায় একই ধারণার বশবর্তী হয়ে মন্তব্য করেছেন—ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যই সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ব্রিজিন গুপ্ত বলেছেন—ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ধৃষ্টতা সিরাজ উদ্দৌল্লার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। নিজ-সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যেই নবাব ইংরেজদের কার্যকলাপে বাধা দিয়েছিলেন। ব্রিজিন গুপ্তের ভাষায়—একশত বছরের সম্পদশালী বাণিজ্য কতকগুলি ছোটো ইংরেজ বণিককে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতে পরিণত করেছিল (A century of opulent trade converted the petty foggying merchants into imperialist swashbucklers.)।

কলকাতা জয় করার পর নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লা সৌকত জংকে দমন করার জন্য পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। মিরজাফরের মদতে সৌকত জং বাংলার সুবাদারি লাভ করার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। ১৭৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর মনিহারিতে সিরাজের হাতে সৌকত জং পরাস্ত হন। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের জয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরাজিত ইংরেজরা ফলতায় পালিয়ে গিয়ে মাদ্রাজ থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষায় বসেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি অত্যন্ত সুদক্ষ ও পেশাদার ইংরেজ বাহিনী কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করে। ১৭৫৭ সাল ৯ ফেব্রুয়ারি নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লা ইংরেজদের সঙ্গে আলিনগরের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজদের ফ্যাক্টরি এবং বাণিজ্যিক অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নবাব ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হন। ইংরেজ কোম্পানি কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের এবং 'সিক্কা' টাকা তৈরি করার অনুমতি লাভ করে। ক্লাইভ এই সন্ধিচুক্তিকে "ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে সম্মানজনক ও সুবিধাজনক" (honourable and advantageous for the Company) বলে বর্ণনা করেছিলেন। আলিনগরের সন্ধির পর থেকেই ইংরেজ কোম্পানির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ১৭৫৭ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ ইংরেজ কোম্পানি জগৎ

Scanned with CamScanner

১৭৫৭ সালের ১৩ জুন একটি ক্লাইভ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুর্শিদাবাদের কাছে পলাশির প্রান্তরে ইংরেজ সেনা ২৩ জুন নবাবের বাহিনীর মুখোমুখি হয়। পলাশিতে নামমাত্র যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ শক্তি সহজেই নবাবের বাহিনীকে পরাস্ত করে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে যত সহজে ইংরেজরা জয়লাভ করেছিল বলা হয়ে থাকে তত সহজে ইংরেজরা পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করেনি। অর্থাৎ সম্প্রতি ডেনমার্কের মহাফেজখানায় (Danish archives) একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। চিঠিটির লেখক জন উড্, যিনি ইংরেজ পক্ষে পলাশিতে যুদ্ধ করেছিলেন। জন উড্ লিখেছিলেন—সকাল থেকে ইংরেজদের অবস্থা, আদৌ নিরাপদ ছিল না; রাত পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা তারা চিন্তা করেনি। রিয়াজ-উস্-সালাতিনের লেখক বলেছেন—নবাবের পক্ষেই জয়ের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কামানের গোলায় নবাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মিরমদন নিহত হলে, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এমনকি ইংরেজ লেখক লিউক্ স্ক্র্যাফটন, যিনি পলাশিতে উপস্থিত ছিলেন, লিখেছেন—আমাদের সাফল্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যে, আমাদের মিরমদনকে হত্যা করার সৌভাগ্য হয়েছিল (One great cause of our success was that ..... we had the good fortune to kill Mir Madan.)। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মিরজাফর ও রায় দুর্লভের নেতৃত্বাধীন এক বিরাট সংখ্যক নবাবি সৈন্য যুদ্ধের প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। ফলে ইংরেজদের জয়লাভ অনেকটাই সহজ হয়েছিল। পলাশিতে পরাস্ত হয়ে সিরাজ উদ্‌দৌল্লা পলায়ন করেন। পথে মিরজাফরের লোকেদের হাতে সিরাজ নিহত হন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে মিরজাফর বাংলার নতুন নবাব পদে আসীন হলেন।

৫.১.২ মিরজাফর

জগৎ শেঠের সংস্থা বাংলার রাজস্ব বিষয়ে নতুন নবাব মিরজাফরের অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং মিরজাফরের নিরাপত্তার জন্য এই মিত্রতা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্লাইভ মিরজাফরকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জগৎ শেঠের মতামত নিয়ে চলেন। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ সত্ত্বেও ইংরেজরা প্রত্যক্ষভাবে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেনি। মিরজাফরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার আগে ইংরেজ কোম্পানি তাঁর সঙ্গে কতকগুলি চুক্তি করে। ১. ইংরেজ কোম্পানি বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার এবং সব রকম বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা পাবে। ২. টাকা তৈরির একচেটিয়া অধিকার আর জগৎ শেঠের হাতে থাকল না; ইংরেজ কোম্পানিও টাকা তৈরির অধিকার পেল। ৩. কোম্পানি চব্বিশ পরগনা জেলার জমিদারি পেল এবং বলা হল ঐ অঞ্চল থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব দিয়ে কোম্পানি তার সামরিক ব্যয়-নির্বাহ করবে। ৪. কলকাতার ওপর নবাবের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। ৫. মুর্শিদাবাদে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত থাকবে। ৬. প্রয়োজনে কোম্পানি নবাবকে সামরিক সাহায্য দেবে। চুক্তির শর্তগুলি একটু মন দিয়ে অনুধাবন করলেই দেখা যায় যে সরাসরি শাসনভার গ্রহণ না করলেও ইংরেজ

পলাশীর যুদ্ধ

Scanned with CamScanner

সুবাদারের পদ লাভ করবেন। মিরজাফর এই বন্দোবস্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং মিরকাশিমকে ডেপুটি সুবাদার পদে গ্রহণ করলেন না। তখন ১৭৬০ সালের অক্টোবর মাসে ভান্সিটার্ট ও ক্যালিয়ড শক্তি ও ভীতি প্রদর্শন করে মিরজাফরকে পদচ্যুত করেন এবং মিরকাশিমকে নতুন নবাব পদে অধিষ্ঠিত করেন। রক্তপাতহীন ও নিরুপদ্রব এই 'বিপ্লব' এর গুরুত্ব কম ছিল না। মিরজাফরের পদচ্যুতি স্পষ্টই প্রমাণ করেছিল তারাই বাংলাদেশে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং রাজা তৈরির নায়ক বা King Maker। যে ব্যক্তি তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এবং ক্রমবর্ধমান সম্পদ লালসা মেটাতে সাহায্য করবে, তাকেই তারা বাংলার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত করবে।

৫.১.৩ মিরকাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ

১৭৬০ সালে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হয়েই মিরকাশিম ইংরেজ কোম্পানির হাতে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের জমিদারি তুলে দেন। যে সমস্ত ইংরেজ তাঁকে নবাব হতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সন্তুষ্ট থাকার জন্য তিনি প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা মূল্যের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল মিরকাশিমকে দিয়ে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু অচিরেই ইংরেজরা আশাহত হয়েছিলেন। মিরকাশিম মিরজাফরের মতো অপদার্থ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। পূর্ব ভারতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর রাজ্যের সমস্যাগুলি বোঝার ব্যাপারে তিনি তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে হলে দুটি পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত, মারাত্মক আর্থিক সংকট থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয়ত, একটি সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা। তিনি যখন বাংলার মসনদে বসেন তখন বাংলার রাজকোষ প্রায় শূন্য। তার ওপর ইংরেজ কোম্পানিকে তার পাওনা মেটাতে গিয়ে এবং সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের মূল্যবান উপঢৌকন দিতে গিয়ে আর্থিক সংকট চরমে উঠেছিল।

নবাব হবার পরই মিরকাশিম কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজদের প্রিয়পাত্র বিহারের দেওয়ান রামনারায়ণকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। রামনারায়ণের কাছে নবাবের প্রচুর টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু সে টাকা মিটিয়ে দিতে রামনারায়ণ অহেতুক দেরি করেছিলেন। তাছাড়া রামনারায়ণ কখনোই নবাবের প্রতি প্রত্যাশিত আনুগত্য দেখাননি। তাই মিরকাশিম তাঁকে বিতাড়িত করে হত্যা করেন। তারপর মিরকাশিম বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। সামরিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৯০,০০০ সৈন্য নিয়ে গড়ে ওঠা নবাবের পুরোনো বাহিনীকে তিনি বাতিল করেন। পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের একট সুদক্ষ বাহিনী তিনি গড়ে তোলেন। এই নতুন সামরিক বাহিনীকে পাশ্চাত্য কৌশলে সুশিক্ষিত করার জন্য গুর্গিন খান নামে জনৈক আর্মেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা হয়। মুঙ্গেরে অস্ত্র-নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। ইংরেজদের পাওনা মেটানোর জন্য জগৎ শেঠদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু

ইংরেজদের পক্ষপাতী হওয়ায় জগৎ শেঠ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের মিরকাশিম তাঁর নতুন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিলেন।

রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য মিরকাশিম আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তিনি জায়গিরদারগুলির উপর নবাবি কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে নতুন করে কর ধার্য করলেন। যেসব জমিদারগুলিকে নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল কম, সেখানে বর্ধিত রাজস্বের বোঝা চাপানো হল। নবাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিহারে তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি সেখানকার জমিদারদের আরও বেশি পরিমাণে রাজস্ব দিতে বাধ্য করেন। যদিও মিরকাশিম শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক স্তরেই দক্ষতা এনে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তবুও সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে তাঁর নির্ধারিত রাজস্বের একটা বৃহৎ অংশই আদায় করা যায়নি। যাই হোক, নবাব হবার পর ইংরেজরা মিরকাশিমের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। কোম্পানি তিনটি জেলার জমিদারি পেয়ে এবং কোম্পানির কর্মচারীরা প্রচুর মূল্যবান উপহার লাভ করে খুশি হয়েছিল। বিহারে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে কোম্পানি মনে করেছিল মিরকাশিম বিহারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইংরেজদের বশংবদ রামনারায়ণের পদচ্যুতি কিছু ইংরেজকে অখুশি করলেও সাধারণভাবে বিষয়টিকে তারা কুনজরে দেখেনি কারণ স্বয়ং ভ্যান্সিটার্ট সে সময়ে রামনারায়ণের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

১৭৫৭ সালের পর কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ব্যক্তিগত বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে মিরকাশিম ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের অবনতির সূত্রপাত। ইংরেজ বণিক ও তাঁদের ভারতীয় দালালেরা এমন সব এলাকায় বাণিজ্যে লিপ্ত হতে লাগলেন যেখানে তাঁরা আগে প্রবেশ করেননি। এমন সব পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলেন, যেসব পণ্যের ওপর এতদিন পর্যন্ত বাংলা সরকারের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার স্বীকৃত ছিল। লবণ ব্যবসা ছিল এরকম একটি বিষয়। ১৭৬০ সালের প্রথমদিকে ইউরোপীয়রা কোম্পানির প্রত্যক্ষ এক্তিয়ারের বহির্ভূত এলাকায় লবণ তৈরি করতে শুরু করে। ১৭৬২ সালের মধ্যে ঢাকা ও লক্ষ্মীপুরের লবণ কারখানার ওপর ইংরেজ বণিকদের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই মিরকাশিমকে ক্ষুব্ধ করেছিল। লবণ তৈরির ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর ইংরেজ বণিকরা শুধু কলকাতা শহরেই নয় সমগ্র বাংলাদেশে লবণ বিক্রি করার নিজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলে। ইংরেজ বণিকেরা নৌকো ভর্তি করে লবণ কোম্পানির কুঠিগুলিতে বা অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যেত এবং সেখানে সেগুলি বিক্রি করার ব্যবস্থা করত। লবণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের এই প্রক্রিয়া নবাবের একচেটিয়া কারবারের অধিকারকে সরাসরি লঙ্ঘন করেছিল।

নবাবের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজ বণিক কর্তৃক দস্তকের মারাত্মক অপব্যবহার। মিরকাশিম দেখলেন যে দস্তকের অপব্যবহারের ফলে বাংলার অর্থনীতি দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক, বাণিজ্যশুল্ক বাবদ রাষ্ট্রের আয় কমছে। দুই, এক

অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার ফলশ্রুতি হিসাবে দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ফলে নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকদের এই বেআইনি ব্যবসা বন্ধ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। বেশকিছু লবণবাহী নৌকো আটক করা হল। ১৭৬২ সালের শুরু মাসে ভ্যান্সিটার্ট নিজে স্বীকার করলেন যে তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের লবণ ব্যবসায়ের জন্য দস্তক দিয়েছেন। শুধুমাত্র লবণের ক্ষেত্রে নয় পান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও ইংরেজ বণিকেরা দস্তকের অপব্যবহার ঘটিয়ে নবাবকে প্রচুর বাণিজ্যশুল্ক ফাঁকি দিত। তামাক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তারা নবাবকে নামমাত্র বাণিজ্যশুল্ক দিত।

শুল্কমুক্ত বাণিজ্য ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়েছিল এবং এই সময়ে তারা অকল্পনীয় পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে থাকে। ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পিয়ার এই সময়কালকে "খোলাখুলি ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ" (period of open and unshamed plunder) বলে অভিহিত করেছেন। ইংরেজ বণিকদের বিনাশুল্কে বা অত্যল্প শুল্কে সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য করার ফলে কেবলমাত্র ভারতীয় বণিকরাই নয়, আর্মেনীয় বণিকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিহারের শোরা কারবারের ওপর ইংরেজ কর্মচারীদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হবার ফলে আর্মেনীয় বণিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তার ওপর এই অসম প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিঘ্নিত করেছিল। মিরকাশিম উপলব্ধি করেন যে আর্মেনীয়দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে তাদের ক্ষোভের নিরসন করা দরকার। ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য কেবলমাত্র বিনাশুল্কেই চালাতেন না। তাঁরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বলপ্রয়োগ করে বা ভীতি সঞ্চার করে ন্যায্যমূল্যের থেকে অনেক সস্তায় পণ্য খরিদ করতেন। ১৭৬২ সালের মে মাসে নবাব মিরকাশিম এ বিষয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। মিরকাশিম হিসাব করেছিলেন যে ইংরেজ বণিকদের দস্তকের অপব্যবহার এবং বলপূর্বক সস্তায় পণ্য খরিদ করার ফলে রাষ্ট্রের আয় বছরে ২৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের এই প্রক্রিয়ার ফলে ভূমিরাজস্ব আদায়ও ব্যাহত হয়েছিল। কৃষক উৎপাদনকারীরা (peasant-producers) লবণ, তামাক প্রভৃতির উৎপাদন বন্ধ করে দেন। ফলে তাঁদের আয় কমে যায় এবং তাঁদের পক্ষে সরকারকে কর দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। নবাব মিরকাশিম কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে একের পর এক অভিযোগ জানিয়ে গেলেন। কিন্তু তাতে যখন কোনো ফল হল না, তখন তিনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৭৬২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলার বিভিন্ন নদীমুখে ইংরেজ বণিকদের পণ্যবাহী নৌকো মিরকাশিমের কর্মচারীরা আটক করলেন।

এই অবস্থায় ১৭৬২ সালের শেষের দিকে ভ্যান্সিটার্ট এ বিষয়ে নবাবের সঙ্গে আলোচনার জন্য মুঙ্গের যান। ভ্যান্সিটার্ট মিরকাশিমকে আশ্বাস দিলেন যে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেও ইংরেজ বণিক ও তাদের গোমস্তাদের অপকর্ম বন্ধ করা হবে। বিনিময়ে মিরকাশিম প্রতিশ্রুতি দেন যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকদের ওপর ৯ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য করা হবে। সেখানে দেশীয় বণিকদের ওপর শুল্ক ধার্য হবে ২৫ শতাংশ হারে। গভর্নর

ভ্যান্সিটার্ট মেনে নিলেন এবং একথাও বলে গেলেন যে ভবিষ্যতে বাণিজ্য-সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বা বিরোধ দেখা দিলে নবাবের কর্মচারীরাই তার নিষ্পত্তি করবেন। কিন্তু একপক্ষে কলকাতা কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা জানিয়ে দেয় যে ইংরেজ বণিকেরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লবণের ওপর আড়াই শতাংশের বেশি শুল্ক দেবে না এবং ইংরেজ বণিকদের বিচার করবেন ইংরেজরা, নবাবের কর্মচারীরা নয়। মিরকাশিম ইংরেজদের চাপের কাছে মাথা নত করলেন না। তিনি তাঁর কর্মচারীদের কাছে অবাধ্য ইংরেজ বণিকদের কঠোর হাতে দমন করার নির্দেশ পাঠালেন। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে নবাবের কর্মচারী ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে ছোটোখাটো মারদাঙ্গা আরম্ভ হল। এই অবস্থায় মিরকাশিম আরেকটি কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত শুল্ক তুলে দেন। অর্থাৎ ভারতীয় বা অন্যান্য বণিকদেরও কোনো বাণিজ্যশুল্ক দিতে হবে না। ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর কোনো অসম প্রতিযোগিতা থাকল না। অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় বণিকদের রক্ষা করার এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু এর ফলে রাষ্ট্রের আয় বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেল। অন্যদিকে ইংরেজ বণিকেরা নবাবের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হলেন। মিরকাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা নানারকম মতামত দিয়েছেন। মিরকাশিমের সমসাময়িক জনৈক ইংরেজ কর্তাব্যক্তি ভেরেলেস্ট বলেছেন—দস্তকের অপব্যবহার বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নয়, মিরকাশিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এই সংঘর্ষের জন্য দায়ী। ভেরেলেস্টের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে ইংরেজ ঐতিহাসিক ডড্‌ওয়েল (Dodwell) মন্তব্য করেছেন—মিরকাশিম ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে যুদ্ধের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। পি. জে. মার্শাল বলেছেন—মিরকাশিম প্রথম থেকেই তাঁর ওপর ব্রিটিশ প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর তিন বছরের নবাবি শাসনে পূর্ব ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা না দিলেও অন্য কোনো অজুহাতে তিনি ইংরেজবিরোধী সংঘাতে অবতীর্ণ হতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেছেন—মিরকাশিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, বা ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করার অভিপ্রায় নয়, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিরোধই ইংরেজ ও মিরকাশিমের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য দায়ী। আমাদের উপরোক্ত আলোচনা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে অধ্যাপক চৌধুরীর বক্তব্যই এ প্রসঙ্গে সঠিক। এমনকি ক্লাইভ পর্যন্ত বাংলাদেশে পুনরায় ফিরে আসার পর ১৭৬৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি লন্ডনে কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্‌কে পাঠানো চিঠিতে লিখেছিলেন—সাম্প্রতিককালের বাংলায় যাবতীয় রক্তপাত, হত্যা ও ঝামেলার মূলে ছিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Inland trade had been the foundation of all bloodshed, massacre and confusion which have happened of late years in Bengal.)। মালদার রেসিডেন্ট গ্রে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিক ও তাদের গোমস্তাদের নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া এবং দেশীয় বণিক ও রায়তদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর জন্য তীব্র

Scanned with CamScanner

নিন্দা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকদের অন্যায় আচরণ বন্ধ করার জন্য মিরকাশিম যখন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, তখন ইংরেজ কোম্পানি তাঁর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৭৬৩ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মিরকাশিমের যুদ্ধ শুরু হয়। মিরকাশিম পরপর কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। মিরকাশিম অযোধ্যায় পালিয়ে যান। যে মুহূর্তে ইংরেজদের সঙ্গে মিরকাশিমের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সে মুহূর্তে ইংরেজরা বাংলার মসনদ থেকে মিরকাশিমকে অপসারিত করে মিরজাফরকে বাংলার নবাব পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব পদে অধিষ্ঠিত হবার পর মিরজাফর ইংরেজদের প্রায় সব দাবি মেনে নেন। প্রথমেই সমস্ত বাণিজ্যশুল্ক তুলে দেবার যে আদেশ মিরকাশিম জারি করেছিলেন, তা মিরজাফর প্রত্যাহার করে নেন। ইংরেজ কর্মচারীদের বিনা শুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মেনে নেওয়া হল। বলা হল, কেবলমাত্র লবণের ওপর ইংরেজ বণিকেরা আড়াই শতাংশ হারে বাণিজ্যশুল্ক দেবেন। ইংরেজ কোম্পানি পূর্ণিয়ায় উৎপাদিত শোরার অর্ধেক খরিদ করার অধিকার লাভ করে। কলকাতায় ইংরেজদের তৈরি মুদ্রা মুর্শিদাবাদের টাকশালে তৈরি 'সিক্কা' মুদ্রার সমান মর্যাদা লাভ করল এবং সিদ্ধান্ত হল যে কলকাতায় তৈরি মুদ্রা থেকে কোনো বাট্টা কেটে নেওয়া হবে না। স্থির হল— শ্রীহট্টের চুন উৎপাদনের ওপর এখন থেকে নবাব ও কোম্পানির যৌথ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কোম্পানির যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য মিরজাফর কোম্পানিকে মাসিক ৫ লক্ষ টাকা করে দিতে স্বীকৃত হলেন। বাংলা নবাবির স্বাধীন সত্তা বলে কিছু রইল না। বাংলার প্রতিরক্ষা পুরোপুরি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল।

পরপর যুদ্ধগুলিতে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হবার পরও কিন্তু মিরকাশিম হতোদ্যম হননি। তিনি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি অযোধ্যার ওয়াজির সুজা উদ্‌দৌল্লা এবং দিল্লির তদানীন্তন মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের সাথে যোগাযোগ করে একটি ইংরেজবিরোধী মোর্চা তৈরি করেন। ১৭৬৪ সালের অক্টোবর মাসে এই তিন শক্তির মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ বক্সারের যুদ্ধ নামে খ্যাত। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি ১৭৬৪ সালের ২৩ অক্টোবর উপরোক্ত তিন শক্তির মিলিত বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে। দ্বিতীয় শাহ্ আলম তৎক্ষণাৎ ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন। সুজা উদ্‌দৌল্লা রোহিলখণ্ডে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। মিরকাশিম আত্মগোপন করেন। ১৭৭৭ সালে মিরকাশিমের মৃত্যু হয়।

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পলাশির প্রান্তর থেকে ইংরেজ শক্তি তাঁদের যে বিজয় অভিযান আরম্ভ করেছিল বক্সারে তা সম্পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশের ওপর ইংরেজ কোম্পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া এই যুদ্ধে ইংরেজরা কেবলমাত্র বাংলার নবাবকে নয়, অযোধ্যার ওয়াজির এবং দিল্লির সম্রাটকেও পরাস্ত করেছিল। ফলে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বক্সারে জয়লাভের ফলশ্রুতি হিসাবেই ইংরেজরা দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে। বাংলার রাজস্বের ওপর আইনি অধিকারের স্বীকৃতি লাভ করার ফলে ইংরেজদের ভারতবর্ষ জুড়ে

ক্ষমতা বিস্তার করা অনেক সহজ হয়েছিল। তাই একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির বিজয় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করেছিল।

১.৯ ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

বক্সারের যুদ্ধের অল্পকাল পরে ক্লাইভ ১৭৬৫ সালের মে মাসে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এসেই ক্লাইভ বলেছিলেন—আমাদের নিজেদেরই নবাব হতে হবে (We must indeed become the Naboobs ourselves.)। ইতিমধ্যে ১৭৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মিরজাফর মারা গেলে বাংলার নবাব হলেন তাঁর পুত্র নজম্ উদ্‌দৌল্লা। ফেব্রুয়ারি মাসেই ইংরেজরা নজম্ উদ্‌দৌল্লার সঙ্গে একটি চুক্তি করে। ঐ চুক্তিতে বলা হয় যে ইংরেজদের মনোনীত এক ব্যক্তি বাংলার নায়েব নাজিম বা ডেপুটি সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং তিনিই বাংলার শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি দেখাশোনা করবেন। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা না করে নবাব নায়েব জিমকে পদচ্যুত করতে পারবেন না। এই চুক্তি অনুযায়ী নায়েব নাজিম পদে মনোনীত হলেন মহম্মদ রেজা খান। রেজা খানের মাধ্যমে বাংলার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ইংরেজরা হস্তগত করে এবং নবাব নজম্ উদ্‌দৌল্লাকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ক্লাইভ বাংলাদেশে ফিরে এলেন।

বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির বিজয়ের পর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল সেই পরিস্থিতিকে ইংরেজ শক্তির স্বার্থে ব্যবহার করতে ক্লাইভ বদ্ধপরিকর ছিলেন। যেহেতু মিরকাশিম ছাড়াও অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্‌দৌল্লা এবং দিল্লির মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমও ইংরেজদের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন সেহেতু ক্লাইভ বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য অনায়াসেই কায়েম করতে পারতেন। কিন্তু ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ ক্লাইভ সেই মুহূর্তে এই বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। কারণ তিনি ইংরেজ শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি তাই দ্বিতীয় শাহ্ আলম এবং সুজা উদ্‌দৌল্লার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে সুজা উদ্‌দৌল্লা তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। বিনিময়ে তাঁকে ইংরেজদের ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হল। কেবলমাত্র কারা ও এলাহাবাদ অযোধ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মোগল সম্রাটকে দিয়ে দেওয়া হল। মোগল সম্রাট শাহ্ আলমকে দিল্লির সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। বিনিময়ে শাহ্ আলম বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি একটি ফরমানের মাধ্যমে ইংরেজ কোম্পানির হাতে তুলে দেন। এর বিনিময়ে ইংরেজরা শাহ্ আলমকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তাছাড়া ইংরেজরা বাংলার নবাব নজম্ উদ্‌দৌল্লাকে বাৎসরিক ভাতা হিসাবে ৫৩ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত। দেওয়ানি লাভ করে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ অধিকার লাভ করে। এই অধিকার লাভ করার ফলে যে

Scanned with CamScanner

কোম্পানির অর্থনৈতিক স্বার্থ যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। বাস্তবপক্ষে মিরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোম্পানির প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। শাহ্‌ আলমের কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করে ক্লাইভ ইংরেজ কোম্পানির আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এই প্রয়াসে তিনি সফলও হয়েছিলেন।

তাছাড়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। বাংলার প্রাদেশিক অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করার আইনি স্বীকৃতি লাভ করেছিল ইংরেজরা। আর এই অধিকার তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্বয়ং দিল্লির সম্রাট। নজম্‌ উদ্দৌলার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ইংরেজরা আগেই বাংলার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল। শাহ্‌ আলমের ফরমান তাদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিয়েছিল।

ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাকে ঐতিহাসিকেরা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বা Dual system of administration বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ দুজন শাসকের অধীনস্থ হয়। বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা সমেত যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রশাসন রইল ইংরেজ কোম্পানির হাতে। অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নিজামতের দায়িত্ব সমেত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রইল নবাব নজম্‌ উদ্দৌলার হাতে। কিন্তু দেওয়ানির দায়িত্ব হাতে না থাকার ফলে নবাবের রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বলা হয়েছে এলাহাবাদ চুক্তির ফলশ্রুতি হিসাবে ইংরেজ কোম্পানি পেল দায়িত্ববিহীন অধিকার এবং বাংলার নবাব পেলেন অধিকারবিহীন দায়িত্ব।

এলাহাবাদ চুক্তির শর্তাবলি এবং দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের ফরমান কি ঐতিহ্যগত মোগল ব্যবস্থায় বিচ্যুতি ছিল? আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়ে না। কারণ মোগল ব্যবস্থায় একটি সুবায় দেওয়ানি ও নিজামতের দায়িত্ব দুজন পৃথক ব্যক্তির ওপর অর্পিত হত। আকবরের আমল থেকেই এই প্রথা অনুসৃত হয়ে এসেছে। রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা দেখাশোনা করতেন দেওয়ান। অন্যদিকে সুবার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করা এবং ফৌজদারি মামলা-মকদ্দমার তত্ত্বাবধান করার দায়িত্বে থাকতেন সুবাদার। দেওয়ান ও সুবাদারকে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে বদলি করা হত। আওরঙজেবের শাসনকালের শেষদিকে অবশ্য এই নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছিল। একই ব্যক্তির হাতে দু'ধরনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল এবং তাদের বদলি করার ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আওরঙজেবের মৃত্যুর পর দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাবান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনো ব্যক্তি উভয় ক্ষমতাই নিজহাতে কুক্ষিগত করেছেন। বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান সুবাদার আজিম-উস্-শানকে ক্ষমতাচ্যুত করে একই সঙ্গে বাংলার দেওয়ানি ও সুবাদারি লাভ করে বাংলার সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোম্পানির হাতে দেওয়ানির দায়িত্ব তুলে দিয়ে দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম আপাতদৃষ্টিতে মোগল ব্যবস্থা বিরোধী কোনো কাজ করেননি। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে গোটা বিষয়টিকে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে শাহ্‌ আলমের ফরমান ছিল নানাদিক দিয়ে

মোগল ব্যবস্থার মারাত্মক বিচ্যুতি। প্রথমত, ইংরেজ কোম্পানি বাংলার নবাব নজম্‌ উদ্দৌলার সঙ্গে ১৭৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে চুক্তি করেছিলেন সেই চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা নবাবের মনোনীত নায়েব নাজিম রেজা খানের মাধ্যমে যাবতীয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। আর এখন ১২ আগস্টের ফরমান অনুযায়ী দেওয়ানি লাভ করে বাংলার সব ক্ষমতাই তারা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে। দ্বিতীয়ত, শাহ্‌ আলমের ফরমান অনুযায়ী গোটা বাংলার রাজস্বের পূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছিল ইংরেজরা। মোগল ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার দেওয়ানের ছিল না। দেওয়ানি লাভের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবাদারি ক্ষমতা অর্থাৎ প্রদেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল এবং তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সুবিধা হয়েছিল। তৃতীয়ত, শাহ্‌ আলমের ফরমানে মোগল ব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো বিচ্যুতি ছিল এইখানে যে এই প্রথম একটি বিদেশি শক্তির হাতে একটি প্রদেশের দেওয়ানির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ইংরেজ কোম্পানির বেশ কিছু কর্মচারী অযোধ্যাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্লাইভ তা চাননি। তিনি সম্ভাব্য মারাঠা ও আফগান আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অযোধ্যার অস্তিত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন। এমনকি প্রয়োজনে অযোধ্যাকে তিনি সামরিক সাহায্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিছুদিন পরে কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি অযোধ্যার নবাবকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৬৬ সালে বাংলার নবাব নজম্‌ উদ্দৌলা মারা গেলে বাংলার নবাব হন তাঁর নাবালক পুত্র সৈফ উদ্দৌলা। ইংরেজ কোম্পানি তৎক্ষণাৎ নবাবকে দেয় বাৎসরিক ভাতার পরিমাণ ৫৩ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ লক্ষ টাকা করে। বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজরা যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ফলে সামরিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তাদের আরও সাফল্যলাভের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেল যে ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইংল্যান্ড থেকে রুপো নিয়ে আসার পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ হারে হ্রাস পায়। কারণ বাংলার রাজস্ব বাবদ কোম্পানির যে আয় হত, তা ছিল তাদের বিনিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট বেশি। তাই ইউরোপ থেকে রুপো আমদানি করার প্রয়োজন আর পড়ত না। প্রায় সমগ্র রাজস্বই ভোগ করার অধিকারী হয়েছিল কোম্পানি, যদিও কোম্পানি মোগল সম্রাটকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে আলিবর্দির আমল থেকেই দিল্লির দরবারে বাংলা থেকে রাজস্বের একটা অংশ যাওয়ার ব্যাপারটি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকেই বাংলার নবাবেরা ইংরেজ শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। বক্সারের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা তাদের ক্ষমতাকে আরও নিরঙ্কুশ করেছিল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলার নবাবদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের শেষ রেখাটুকু মুছে গেল।

Scanned with CamScanner

৫.২ ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক ও ইংরেজদের মহীশূর বিজয়

মহীশূর রাজ্যের হিন্দুরাজাদের ক্ষমতাচ্যুত করে হায়দর আলি ১৭৬১ সালে ঐ রাজ্যে নিজ-ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। হায়দর আলির উদ্দেশ্য ছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছোটো ছোটো রাজ্যগুলির ওপর নিজ-কর্তৃত্ব বিস্তার করা এবং মারাঠা আগ্রাসনের হাত থেকে নিজের এলাকা সুরক্ষিত করা। ১৭৬১ থেকে ১৭৬৪ সালের মধ্যে তিনি হোস্কট, দোদ্‌বল্লাপুর, সেরা, বেদনুর ও সোন্ডা দখল করে নেন। তবে মারাঠা নেতা পেশবা মাধব রাও-এর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হায়দর তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এলাকার ওপর নিজ-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। মাদ্রাজের ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মহীশূর রাজ্যের অপরিমিত সম্পদ ও সমৃদ্ধি প্রলুব্ধ করেছিল। আবার হায়দর আলির সাথে ফরাসি কোম্পানির ঘনিষ্ঠতা মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রস্ত করেছিল।

মহীশূর রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির কালোমাটিতে উৎকৃষ্ট তুলো উৎপাদিত হত। রাজ্যের পশ্চিমদিক ছিল কৃষি-উর্বর অঞ্চল। হায়দর আলির সময়ের মহীশূর রাজ্যে প্রচুর দক্ষ কারিগর বসবাস করতেন এবং রাজ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হয়েছিল। মহীশূর রাজ্যের রাজধানী সেরিঙ্গাপত্তনমে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল থেকে এবং উত্তরে হায়দ্রাবাদ থেকে নানা ধরনের পণ্য আসত। বিনিময়ে মহীশূর রাজ্য বিভিন্ন স্থানে কাঠ, শস্য বস্ত্র প্রভৃতি পণ্য রপ্তানি করত। হায়দর আলি ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকা সমেত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে বণিক এবং কৃষকদের আসতে উৎসাহিত করতেন। এডওয়ার্ড মুর নামে জনৈক ইংরেজ পর্যবেক্ষক মহীশূর রাজ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—কৃষিসমৃদ্ধ এবং পরিশ্রমী মানুষের দ্বারা জনবহুল অঞ্চল, নতুন শহর গড়ে উঠেছে এবং বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটছে (Well cultivated; populous with industrious inhabitants, cities newly founded and commerce extending.)। মহীশূরের সুলতানেরা পশ্চিমে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করতে আগ্রহী ছিলেন। ফলে তাঁরা মালাবার উপকূলে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। হায়দর আলি মন্তব্য করেছিলেন—আমি ইংরেজদের স্থলে পরাজিত করতে পারি, কিন্তু সমুদ্রে আমি নিরুপায়। হায়দর পুত্র টিপু সুলতান উপলব্ধি করেছিলেন যে পশ্চিম উপকূলে ইংরেজ কোম্পানির গোলমরিচ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঐ এলাকার সমস্ত ভারতীয় রাজ্যের সামনে মারাত্মক বিপদের সূচনা করেছে। তাই তিনি বন্দর-নগরগুলিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তুলে আরব ও পারস্যদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন।

৫.২.১ প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ.

হায়দর আলির ফরাসিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর দরবারে শেভালিয়ার, ডি-মৌহি, ডি-লর ট্যুর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ফরাসি অফিসারের যাতায়াত ছিল। এই ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের উষ্মার কারণ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের সময় হায়দর আলি ফরাসিদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য এই সাহায্যদানের পেছনে হায়দরের ইংরেজ বিরোধিতা ছিল না, ছিল ফরাসিদের প্রতি

কৃতজ্ঞতাবোধ। কারণ মহীশূরে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার সময় তিনি ফরাসিদের সাহায্য পেয়েছিলেন। তাছাড়া হায়দর আলি আর্কটের নবাব মহম্মদ আলির শত্রু ও বড়ো ভাই মহফুজ খানকে নিজ-রাজ্যে আশ্রয় দেন। মহম্মদ আলির আর এক শত্রু চাঁদা সাহেবের পুত্র রাজা সাহেবকে তিনি নিজ-কর্মচারী পদে নিয়োগ করেন। তাছাড়া তাকর, পলাশী, ডিণ্ডিগুল প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকার নিয়ে মহীশূর ও আর্কটের মধ্যে বিরোধ ছিল। আর্কটের নবাব মহম্মদ আলির সঙ্গে ইংরেজদের মিত্রতা ছিল। হায়দরের বিভিন্ন পদক্ষেপ তাই ইংরেজ কোম্পানি ও আর্কটের নবাবকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ১৭৬৬ সালে ইংরেজ কোম্পানির মাদ্রাজ সরকার হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে একটি মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং মহীশূর রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা করে। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়।

ইংরেজ কোম্পানি ও নিজামের মিলিত বাহিনী মহীশূরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। এই অবস্থায় নিজামের মিত্র পেশবা মাধব রাও মহীশূর রাজ্যের ওপর ব্যাপক লুণ্ঠন চালান। ত্রিশক্তির সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পড়েও হায়দর আলি বুদ্ধিভ্রষ্ট হননি। তিনি কূটনৈতিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে ত্রিশক্তির মধ্যে অনৈক্য নিয়ে আসতে প্রয়াসী হলেন। প্রথমে তিনি ২৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মারাঠাদের মিত্রতা ক্রয় করলেন। তারপর হায়দর নিজামের সঙ্গে একটি সমঝোতায় এলেন। তিনি মাহফুজ খানের মারফত নিজামকে প্রচুর উপঢৌকন পাঠালেন। ফলে ইংরেজ কোম্পানি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৭৬৭-৬৮ সালে হায়দর আলি ও ইংরেজদের মধ্যে অনেকগুলি যুদ্ধ হয়। কিন্তু এই যুদ্ধগুলিতে কেউই চূড়ান্ত জয়লাভ করতে পারেননি। ইংরেজ সেনাপতি স্মিথের দক্ষতাই হায়দরকে চূড়ান্ত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত করেছিল। ১৭৬৮ সালের মার্চ মাসে নিজাম হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করে পুনরায় ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন। হায়দর তখন একাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ১৭৬৯ সালে হায়দর আলি তাঁর সুদক্ষ ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্যে ইংরেজ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মাদ্রাজের পতন আসন্ন দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং হায়দরকে সন্ধির প্রস্তাব দেন। ১৭৬৯ সালের ৪ এপ্রিল হায়দর আলি ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির চুক্তিতে বলা হল একে অপরের বিজিত অঞ্চলগুলি ফিরিয়ে দেবে। তাছাড়া একটি প্রতিরক্ষামূলক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হল, যেখানে বলা হল যে কেউ কোনো তৃতীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ কোনো পক্ষেরই চূড়ান্ত বিজয় সূচিত করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যুদ্ধের গুরুত্ব লাঘব করা যাবে না। পরবর্তীকালে লন্ডনে কোম্পানির কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ মন্তব্য করেছিল যে এই যুদ্ধ ও যুদ্ধের সমাপ্তকারী সন্ধিচুক্তির ফলশ্রুতি হিসাবে ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থ ও মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এই যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—এই প্রথম একটি যুদ্ধে ইংরেজরা নিজে থেকে একটি ভারতীয় শক্তির সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল (It was the first war in which the British government finished by an Indian power for peace.)।

৫.২.২ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

১৭৭০ সালে পেশবা মাধব রাও যখন মহীশূর আক্রমণ করেন তখন হায়দর আলি ভেবেছিলেন ইঙ্গ-মহীশূর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজরা তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু ইংরেজদের তরফ থেকে কোনো সাহায্য আসেনি। ১৭৭০ সালে বম্বের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে হায়দর আলির একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজ কোম্পানি মহীশূরে বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা লাভ করে। কোম্পানিকে গোলমরিচ ও চন্দন কাঠ খরিদ করার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। বিনিময়ে কোম্পানি মহীশূরকে বন্দুক, বারুদ, শোরা, সিসা প্রভৃতি পণ্য সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ১৭৭২ সালে লন্ডনের কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ কিন্তু এই চুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। ১৭৭৮ সালে ইংরেজ কোম্পানি পন্ডিচেরির ফরাসি ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং মাহের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়। ফরাসিরা মাহের মধ্য দিয়ে হায়দর আলিকে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করত। তাই হায়দর মাহে রক্ষা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। কিন্তু ১৭৭৯ সালের মার্চ মাসে মাহে ইংরেজ শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ইংরেজ ও হায়দরের মধ্যে তিক্ততা যখন চরমে ওঠে তখন হায়দর আলি নিজাম, মারাঠা ও নাগপুরের ভোঁসলেদের সঙ্গে নিয়ে একটি ইংরেজবিরোধী মহাজোট গঠন করেন। ১৭৮০ সালের দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

চার শক্তির সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজ সেনাপতি বেইলির নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে এবং বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আর একজন দক্ষ ইংরেজ সেনাপতি মানরো তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী পরিত্যাগ করে ভয়ে মাদ্রাজে পশ্চাদপসরণ করেন। যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্য পেয়েছিলেন হায়দর। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি আয়ার কুট্ ১৭৮১ সালের জুলাই মাসে পোর্টো নোভোর গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে হায়দরকে পরাজিত করেন। ১৭৮১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আয়ার কুট্ পরপর দুটি যুদ্ধে— পল্লিলোর ও সোলিঙ্গারের যুদ্ধে হায়দর আলিকে পরাজিত করেন। ইংরেজরা ভেলোর অধিকার করে নেন। হায়দর কিছুটা পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ১৭৮২ সালের প্রথমদিকে হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজ সেনাপতি ব্রেথওয়েটকে পরাস্ত করে বন্দি করেন। এই অবস্থায় ফরাসি নৌবহর ইংরেজদের বিব্রত করে তোলে। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে ১৭৮২ সালে ডিসেম্বর মাসে হায়দর আলি মারা যান। তখন তাঁর পুত্র টিপু সুলতান মহীশূর রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। টিপুর হাতে ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুসের পরাজয় ঘটে। বেদনুর টিপুর হস্তগত হয়। ১৭৮৩ সালের মাঝামাঝি সময় টিপু সুলতান ম্যাঙ্গালোর অবরোধ করেন। ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে আর এক ইংরেজ সেনাপতি ক্যাম্পবেল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজ সেনাপতি ফুলারটন কোয়েম্বাটোর দখল করে সেরিঙ্গাপত্তনম আক্রমণ করতে উদ্যত হন। যুদ্ধের ফলাফল যখন অনিশ্চিত, তখন ইংরেজ শক্তি দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে অধৈর্য হয়ে ওঠে। মাদ্রাজের গভর্নর ম্যাকার্টনি টিপুর সঙ্গে সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৭৮৪ সালের ১১ মার্চ টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে ম্যাঙ্গালোর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উভয়পক্ষই তাদের বিজিত অঞ্চলগুলি ফিরিয়ে দিতে এবং যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিতে স্বীকৃত হয়।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অনেকেই এই চুক্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাড়াতাড়ি করে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য মাদ্রাজের গভর্নর ম্যাকার্টনিকে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন ও ম্যাঙ্গালোর চুক্তিকে "অপমানজনক শান্তি প্রতিষ্ঠা" (humiliating pacification) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পিয়ার ম্যাঙ্গালোর চুক্তিতে ইংরেজ শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল একথা মেনে নেননি। তিনি বলেছেন—ভারতীয় শক্তিবর্গ অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি সামনে পেয়েও তার সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছিল (The Indian Powers had done their utmost at the most favourable conjunction of events and had failed)। তাঁর মতে ছোটোখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইংরেজ কোম্পানি প্রমাণ করেছিল যে সে ছিল ভারতীয় রাজাগুলির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাছাড়া সে সময় ইংরেজদের মাদ্রাজ কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। সৈন্যদের বেতন দীর্ঘদিন ধরে বাকি পড়েছিল। এই অবস্থায় মহীশূরের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধ চালাবার পর একটি সম্মানজনক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া মাদ্রাজের গভর্নর ম্যাকার্টনির সামনে কোনো পথই খোলা ছিল না। অন্যদিকে টিপু সুলতানও ইংরেজদের বর্ধিত বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধার দাবি না মেনে যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

৫.২.৩ তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

১৭৮৬ সালে কলকাতায় নতুন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। এসেই তিনি অনুভব করলেন যে ইংরেজদের সঙ্গে টিপু সুলতানের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ছিল অমীমাংসিত এবং ইংরেজ শক্তির পক্ষে সেগুলি ফলপ্রসূ হয়নি। পুনার ইংরেজ দূত ম্যালেট ১৭৮৭ সালে গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিসকে পাঠানো একটি প্রতিবেদনে বলেছিলেন—একজন স্বৈরাচারী শাসকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, একজন গোঁড়া ধর্মান্ধের তীব্র উৎসাহ, উৎকৃষ্ট সামরিক প্রতিভা সম্পর্কে সচেতনতা এবং পরপর সাফল্যকে পুঁজি করে টিপু যুদ্ধজয় করতে আগ্রহী (Tipu is prompted to conquests by the ambition of a despot and the wild enthusiasm of a bigot, supported by a consciousness of superior military talents, founded on frequent success)। ১৭৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কর্নওয়ালিস ম্যালেটকে লিখেছিলেন—চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ফরাসি নীতি এবং টিপুর সীমাহীন আগ্রাসী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং এদের হিংসা ও অন্যায়কে প্রতিহত করতে হলে আমাদের মারাঠা শক্তির সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। ১৭৯০ সালের ১ জুন ইংরেজ কোম্পানি মারাঠা পেশবার সঙ্গে এবং ঐ বছরের ৪ঠা জুলাই ইংরেজ কোম্পানি হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে দুটি পৃথক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিগুলিতে বলা হল কোনো পক্ষ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে অপর পক্ষ তাকে সাহায্য করবে। অর্থাৎ চুক্তিগুলি ছিল টিপুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি। আরও বলা হল যে বিজিত অঞ্চলগুলি তারা সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। তাছাড়া ইংরেজ কোম্পানি কুর্গের রাজা ও কান্নানোরের বিবির সঙ্গে দুটি প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই পরিস্থিতিতে টিপু সম্পূর্ণ মিত্রহীন হয়ে পড়েন। তাঁর পক্ষে ফরাসি সমর্থন আদায় করাও সম্ভব হয়নি, কারণ ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব সমস্ত হিসাব নষ্ট

Scanned with CamScanner

করে দিয়েছিল এবং ভারতবর্ষে টিপুর সঙ্গে ফরাসিদের পারস্পরিক সমঝোতার পথ প্রশস্ত হল। ১৭৮৯ সালে ২৯ ডিসেম্বর টিপু সুলতান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজদের মিত্রতা ছিল। ইংরেজরা তখন টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ নেয়। এইভাবে ১৭৯০ সালের তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়।

লর্ড কর্নওয়ালিস মাদ্রাজের গভর্নর মেডোসকে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ১৭৯০ সালে মে মাসে মেডোস্ মহীশূরবিরোধী অভিযান আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেননি। তখন স্বয়ং কর্নওয়ালিস যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কর্নওয়ালিস বাঙ্গালোর দখল করে টিপুর রাজধানী সেরিঙ্গাপত্তনমের দিকে অগ্রসর হন। এই অবস্থায় টিপু সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। টিপুর প্রতিরোধের সামনে ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তখন কর্নওয়ালিস পিছু হটতে বাধ্য হন, ইংরেজ বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কর্নওয়ালিসের দুর্দশা আরও গভীর হত, যদি না ঠিক সময়ে মারাঠারা ইংরেজদের প্রচুর অস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ করত। ১৭৯১ সালের গ্রীষ্মকালে টিপু কোয়েম্বাটুর দখল করেন। কিন্তু ১৭৯২ সালের প্রথমদিকে ইংরেজরা নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে। ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নওয়ালিস সেরিঙ্গাপত্তনমের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন। তখন টিপু সুলতান বাধ্য হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেন। কর্নওয়ালিস সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেন। ১৭৯২ সালে মার্চ মাসে টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে সেরিঙ্গাপত্তনমের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী টিপু সুলতান তাঁর রাজ্যের অর্ধেক ছেড়ে দিতে এবং তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজদের হাতে পণবন্দি রাখতে বাধ্য হন। মহীশূর রাজ্যের বিজিত অঞ্চল ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কৃষ্ণা নদী থেকে পেনার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড নিজামের হস্তগত হয়। মারাঠা সাম্রাজ্য তুঙ্গভদ্রা নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইংরেজ কোম্পানি মালাবার, দিন্দিগুল, কুর্গ ও বরামহল অঞ্চল লাভ করে। তাছাড়া ইংরেজরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে টিপুর কাছ থেকে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আদায় করে।

সমসাময়িক ইংরেজরা অনেকেই এই চুক্তিকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা এই সুযোগে টিপুর শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কর্নওয়ালিস অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই মহীশূর রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজ শক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি সেই মুহূর্তে মহীশূর রাজ্য সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন তাঁর ভারতীয় মিত্ররা এতে ক্ষুব্ধ হতে পারে। তাছাড়া কর্নওয়ালিসের সন্দেহ ছিল যে লন্ডনের কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ মহীশূর রাজ্য গ্রাসের সিদ্ধান্ত আদৌ অনুমোদন করবে কিনা? কারণ ফরাসি বিপ্লব-পরবর্তী ইউরোপে এক অভূতপূর্ব জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। তাই টিপুর রাজ্য গ্রাস না করে টিপুর হাতে বেশিকিছু এলাকা রেখে দিয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের শক্তিসাম্য মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

৫.২.৪ চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালানোর ফলশ্রুতি হিসাবে এবং তৃতীয় যুদ্ধের পর ইংরেজদের বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে মহীশূরের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল। এই কঠিন

আর্থিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য টিপু এক নতুন রাজস্ব নীতি গ্রহণ করেন। তিনি পুরোনো রাজস্ব কর্মচারীদের অবসরকালীন ভাতা দিয়ে বিদায় করেন ও পরিবর্তে নতুন রাজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভূমিরাজস্ব অন্তত ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা। তাছাড়া বণিকদের কাছ থেকে তিনি অগ্রিম ঋণ নেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রামীণ শিল্পের ওপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার কায়েম করেন। এইসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মহীশূরের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় এবং প্রায় ৬০,০০০ সেনার একটি বাহিনীকে বজায় রাখতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে টিপুর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের হাতে পরাজয় ও সেরিঙ্গাপত্তনমের অপমানজনক সন্ধির প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তাই তিনি মহীশূর রাজ্যের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধের কথা মাথায় রেখে তিনি ফরাসি সাহায্য লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তীকালীন ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতনের পর ন্যাশনাল কনভেনশন গঠনের মাধ্যমে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারও টিপুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তৈরি করেনি। তা সত্ত্বেও টিপু জ্যাকোবিন ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন এবং ফরাসি বিপ্লব ও ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানিয়ে রাজধানী সেরিঙ্গাপত্তনমে 'স্বাধীনতা বৃক্ষ' বা Liberty Tree রোপণ করেছিলেন। তাছাড়া টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার জন্য কাবুল, কনস্ট্যান্টিনোপল, আরব প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে এবং মরিশাসের ফরাসি গভর্নরের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।

টিপু সুলতান যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চরম প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন ভারতে ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড ওয়েলেসলি। ওয়েলেসলি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতে এসেই তিনি এক উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার হেনরি ডান্ডাস ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবক্তা। ভারতীয় শক্তিবর্গের অনেকেই ইংরেজদের অধীনতামূলক মিত্রতা মেনে নিয়ে একে একে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। অধীনতামূলক মিত্রতায় বলা হল— ভারতীয় মিত্র রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন রাখা হবে, সেখানে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বহাল থাকবে, অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণকারী কোনো ভারতীয় মিত্র রাজ্য ইংরেজ কোম্পানির অনুমোদন ছাড়া অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালাতে পারবে না এবং কোনো ইউরোপীয়কে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করতে পারবে না। ১৭৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদের নিজামকে ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। একের পর এক ভারতীয় শক্তি অধীনতামূলক মিত্রতা মেনে নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলেও টিপু সুলতান কিন্তু তাঁর ইংরেজবিরোধী জেহাদ চালিয়ে গেলেন। লর্ড ওয়েলেসলি উপলব্ধি করেছিলেন যে টিপুর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া টিপুর সঙ্গে ফরাসি শক্তির যোগাযোগ ওয়েলেসলিকে আশঙ্কিত করেছিল। ১৭৯৮ সালে ওয়েলেসলি মন্তব্য করেন—বিগত যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকেই

কর্নওয়ালিসের বাহিনীকে মারাঠারা ঠিক সময় সাহায্য করত। মানরো মন্তব্য করেছিলেন—মারাঠা সাহায্য ছাড়া কর্নওয়ালিস টিপুর ক্ষমতা হ্রাস করতে পারতেন না (Cornwallis could not have reduced Tipu without the assistance of the Marathas.)। যদিও চতুর্থ যুদ্ধের সময় মারাঠারা নিরপেক্ষ ছিল; কিন্তু এই নিরপেক্ষতার মূল্য ইংরেজদের কাছে অনেকখানি ছিল। মারাঠা ও মহীশূর—এই দুই শক্তিশালী ভারতীয় রাজ্য যদি একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামত তবে টিপুর পরাজয় হয়তো এতটা সহজ হত না। তাছাড়া টিপুর নিজের কর্মচারীরাও টিপুর বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। টিপুর কর্মচারীরা ইংরেজ বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য প্রয়াসী হয়নি। এই বিশ্বাসঘাতকতার অনিবার্য পরিণতি ছিল সেরিঙ্গাপত্তম দুর্গের পতন।

সবশেষে বলা যায় যে, টিপু সুলতানকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল একটি উন্নত ও সুসংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে। ইংরেজ শক্তির পেছনে ছিল ব্রিটেনের মতো শক্তিশালী একটি দেশ। নিজেদের দেশের শিল্পের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার প্রয়াস হিসাবেই তারা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করে সেখানে অবাধ লুণ্ঠন চালাতে চেয়েছিল। উন্নত পাশ্চাত্য বনাম অনুন্নত ও পশ্চাদ্‌বর্তী প্রাচ্যের সংঘাতে প্রাচ্যের জয় ছিল প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। ইংরেজদের সমর-কৌশল ও সামরিক সরঞ্জাম ছিল অনেক উন্নত। টিপু যদিও তাঁর সামরিক বাহিনীকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমান তালে যুদ্ধ করার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শক্তি ধনতান্ত্রিক জাল বিস্তারের জন্য যে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল মহীশূরের মতো একটি আঞ্চলিক শক্তির পক্ষে তা প্রতিহত করা আদৌ সম্ভব ছিল না। সুতরাং "হায়দর আলি জন্মেছিলেন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং টিপু জন্মেছিলেন তা হারাবার জন্য" (Haidar was born to create an empire, Tipu to lose one.)—ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলক্‌স্ (Wilks)-এর এই বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে ইংরেজবিরোধী যুদ্ধে এই দুজন অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হায়দরের মৃত্যুর সময় (১৭৮৪) পর্যন্ত ইংরেজ শক্তি ভারতবর্ষে ততটা সুসংগঠিত ছিল না। কিন্তু ১৭৮৪ সালে পিটের ভারত শাসন আইনের ফলে অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এই আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল প্রায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হন এবং তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আর কাউন্সিলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হত না। এতদিন পর্যন্ত কোম্পানির কাজকর্মে ব্রিটিশ সরকার নাক গলাত না, কিন্তু এই সময় থেকে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে কোম্পানির সম্প্রসারণশীল নীতিকে সরাসরি মদত দেয়। সুতরাং টিপু যে ইংরেজ শক্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার পেছনে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ও ইংল্যান্ডের সরকারের সম্মিলিত প্রয়াস। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েও শেষপর্যন্ত টিপু ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এই ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য। ইংরেজ কোম্পানির মহীশূর জয় ছিল ভারতবর্ষে কোম্পানির সাম্রাজ্যিক বিস্তারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

Scanned with CamScanner

৬.৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার ইতিহাসে তার প্রভাব

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এবং বাংলার গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন। প্রথমত, ইংরেজ শাসকেরা একদল রাজনৈতিক মিত্র পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁরা সঠিকভাবেই মনে করেছিলেন যে বাংলার চাষিদের ধূমায়িত বিক্ষোভ মোকাবিলা করার জন্য এই ধরনের রাজনৈতিক মিত্রদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জমিদারদের ভূসম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার এবং অপরিবর্তনীয় ও চিরকালীন ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত করার ফলশ্রুতি হিসাবে জমিদারেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার খাতিরে ব্রিটিশ রাজকে সমর্থন করবে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক স্তম্ভে পরিণত হবে। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক স্তর হিসাবে জমিদারেরা বিরাজ করবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ কোম্পানিকে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সমস্যা ১৭৬৫ সাল থেকেই বিব্রত রেখেছিল। ইংরেজ কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করে ভূমিরাজস্ব খাতে একটি স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কর্নওয়ালিস সহ অন্যান্য ইংরেজরা অনেকেই মনে করেছিলেন যে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে কৃষির সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। খোদ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কারণ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের বহু জমিদার এবং বর্ধিষ্ণু চাষির উদ্যোগে কৃষি উৎপাদনের অকল্পনীয় বৃদ্ধি ঘটেছিল। এই ঘটনা ইউরোপের ইতিহাসে 'কৃষিবিপ্লব' (Agricultural Revolution) নামে বিখ্যাত। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত ছিল এই কৃষিবিপ্লব। কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালের মার্চ মাসে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে জমিদারদের ভূসম্পত্তির ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জমিদারেরা বনাঞ্চল ও পতিত জমিগুলিকে কৃষিজমিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেবেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদি হয়ে পড়েছিল। কোম্পানির আশা ছিল জমিদারি উদ্যোগ এই অঞ্চলকে কৃষিযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করবে। চতুর্থত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সময় নিয়ম করা হয়েছিল জমিদারকে তাঁর রাজস্ব দেবার নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে কোম্পানির কাছে রাজস্ব জমা দিতে হবে। অপারগ হলে তাঁর জমি নিলাম করা হবে ও হস্তান্তরিত হবে। এই আইন 'সূর্যাস্ত আইন' বা Sunset Law নামে পরিচিত। কোম্পানির তরফে আশা করা হয়েছিল যে ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিলে অদক্ষ জমিদারের পরিবর্তে দক্ষ জমিদারের মালিকানা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। পঞ্চমত, অসংখ্য রায়তের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় সংখ্যক জমিদারের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বভার ন্যস্ত করে, কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল—রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এটিই হবে সবথেকে সরল ও সস্তা প্রক্রিয়া।

বাংলার জমিদারেরাও খুশিমনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের পরেই দেখা গেল যে দীর্ঘদিন ধরে চলা কৃষিপণ্য মূল্যের স্বল্পতা জমিদারদের বেশ অসুবিধায় ফেলেছিল। ১৭৯৪ থেকে ১৭৯৭ সালের মধ্যে কৃষিপণ্যের বিশেষ দাম

Scanned with CamScanner

বাড়েনি। সম্ভবত সর্বাধিক সংখ্যক জমিদারি বিক্রির ঘটনা এই সময়েই ঘটেছিল। পুরোনো জমিদারেরা কোম্পানির রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জমিদারি সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নিলাম হত এবং অন্য জমিদারের হাতে চলে যেত। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি এবং উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে দেখা যায় যে বহু প্রাচীন এবং ঐতিহ্যশালী জমিদার পরিবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানিকে রাজস্ব জমা দিতে পারেনি। ফলে এই জমিদারিগুলি হস্তান্তরিত হয়েছিল। এই ধরনের জমিদারিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজশাহি, দিনাজপুর, নদিয়া, বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রদ্বীপের জমিদারি। ফিল্ড বলেছেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের বাইশ বছরের মধ্যে বকেয়া রাজস্ব মেটাতে ব্যর্থ হবার দরুন বাংলার সমগ্র ভূসম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি, প্রায় অর্ধেক বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক সিরাজুল ইসলাম মনে করেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বৃহৎ জমিদারিগুলির অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন এবং দেখা যায় যে ছোটো জমিদারিগুলি কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

কোম্পানির তরফ থেকে অবশ্য বড়ো জমিদারিগুলি ধ্বংস হবার কারণ হিসাবে সেই জমিদারদের অমিতব্যয়িতা এবং জমিদারিগুলির অদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়েছিল। এই বক্তব্যে সত্যতা আছে, তবে আংশিক। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মনে করেন—সে সময়ের নিরিখে (১৭৯৩-৯৪) নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট বেশি। তাই জমিদারিগুলি সময়মতো নির্ধারিত রাজস্ব দিতে পারেনি। অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী দেখিয়েছেন—বাংলা ও বিহারে ১৭৯৩-৯৪ সাল থেকে ১৮০৬-০৭ সালের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক জমিদারি বিক্রি হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য জমিদারি বিক্রির সংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু আবার অর্থনৈতিক সংকটের সময়, বিশেষত ১৮৩০ থেকে ১৮৩৪ সালের মধ্যে এবং ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে, প্রচুর জমিদারি বিক্রি হয়েছিল। উল্লিখিত সময়কালে 'এজেন্সি হাউস'গুলি এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের পতনের পরিণতি হিসাবে তীব্র ও ব্যাপক বাণিজ্যিক সংকট দেখা দিয়েছিল। বিনয়ভূষণ চৌধুরি আরও বলেছেন যে—১৮০৪ সালে ওড়িশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পরই সেখানে প্রচুর জমিদারি বিক্রি হতে থাকে। ১৮০৪ সাল থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে রাজস্ব ঠিক সময়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে ওড়িশার ৩০০০ জমির মালিকের মধ্যে ৫১·৬ শতাংশের হাত থেকে জমির মালিকানা চলে গিয়েছিল। যে জমিদারিগুলি বিক্রি হয়ে যায়নি, সেখান থেকে ওড়িশায় ১৮০৪-০৫ সালে মোট নির্ধারিত রাজস্বের মাত্র ২১·৫ শতাংশ আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। এখানেও অবশ্য পরে জমিদারি বিক্রির পরিমাণ হ্রাস পায়।

প্রাপ্ত ঐতিহাসিক দলিল থেকে একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বৃহৎ জমিদারিগুলিকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে ফেলেছিল। এই নতুন ব্যবস্থা বাংলার বড়ো ও ঐতিহ্যশালী জমিদারিগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এই ধ্বংস রোধ করার জন্য এবং জমিদারি নিজের হাতে রাখার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই বড়ো জমিদারেরা একটা অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রজাদের কাছ থেকে দ্রুত খাজনা আদায় করার জন্য তাঁরা তাঁদের জমিদারি ভাগ করে দিতেন; কারণ তাঁরা

জানতেন যে দ্রুত খাজনা আদায় করতে পারলে সময়মতো রাজস্ব কোম্পানিকে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে ও জমিদারি রক্ষা করা যাবে। এইভাবে বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। বড়ো জমিদার যাদের মধ্যে তাঁর জমিদারি ভাগ করে দিয়ে ভূমিরাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিতেন তাদের বলা হত মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার (intermediary landlords)। ১৭৯৯ সালে বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র [illegible] মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মধ্যে তাঁর জমিদারি ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হত পত্তনি ব্যবস্থা। কিন্তু বর্ধমানের রাজা সৃষ্ট এই পত্তনি ব্যবস্থা ছিল ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের ৪৪ নম্বর রেগুলেশনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কোম্পানির সঙ্গে জমিদারদের যেমন চুক্তি হয়েছিল, জমিদারেরাও তাঁদের নিযুক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। শেষপর্যন্ত ১৮১৯ সালের ৮ নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী কোম্পানির সরকার পত্তনি ব্যবস্থাকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছিল। পত্তনি ব্যবস্থার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে এইচ. এইচ. উইলসন বলেছিলেন—এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মধ্যবর্তী জমিদার জমিদারির যে অংশটুকু লাভ করবেন, সেই অংশের ওপর তাঁর চিরকালীন এবং বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি যদি সময়মতো নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিয়ে যান তবে তাঁর পত্তনি তালুকে জমিদার কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে জমিদার পুরোনো মধ্যবর্তী জমিদারের জায়গায় নতুন লোক বসাবেন। তাঁর হাতে জমি বিক্রি করা বা রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁরও অধীনস্থ পত্তনিদার বা ইজারাদার বসানোর পূর্ণ অধিকার থাকবে। কিন্তু সে সময় তাঁকে জমিদারের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে যে পত্তনি ব্যবস্থার সূচনা করেছিল তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদার ও রায়তের মাঝখানে একাধিক মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টি হল। জমিদার একজন মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে তাঁর জমিদারির একাংশ তুলে দিতেন। সেই মধ্যস্বত্বভোগী আবার তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন উপস্বত্বভোগী, যথা—পত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতির হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিতেন। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারেরা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের হাতে ভূমিরাজস্বের দায়িত্ব অর্পণ করে কলকাতায় চলে যেতেন এবং সেখানে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন। ফলে প্রবাসী/অনুপস্থিত জমিদারের (absentee landlord) সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অনুপস্থিত জমিদারেরা ক্রমেই কৃষির উন্নতিসাধন বা কৃষকের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। তৃতীয়ত, পত্তনি ব্যবস্থা চালু হবার পরে রায়তের ওপর খাজনার বোঝা মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপস্বত্বভোগী পত্তনিদার, তালুকদার, ইজারাদার বা জোতদারদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল—কীভাবে আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ বাড়ানো যায়। তাই কৃষির উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে তারা খাজনা আদায়ের জন্য রায়তদের ওপর চরম অত্যাচার চালাত। পুলিশ সুপার ডাম্পিয়ার ১৮৪৩ সালে লিখেছিলেন—ভূমির বিভিন্ন স্তরে উপস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতম মানুষগুলি চরম নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য জে. পি. গ্র্যান্ট ১৮৫৫ সালে লিখেছিলেন—বাংলার সমগ্র জমির দুই-তৃতীয়াংশেরও

Scanned with CamScanner

বেশি পত্তনি তালুকে পরিণত হয়েছে। মধ্যস্বত্বাধিকারী তালুকদার, পত্তনিদার বা ইজারাদারেরা কখনোই কৃষি উদ্যোক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেননি। তাঁদের একমাত্র কাজ ছিল কৃষকদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়ে খাজনা আদায় করা। ১৮৬০ সালে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় লিখিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার কৃষকের ওপর মধ্যবর্তী ভূস্বামীদের শোষণের ব্যাপারে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি হিসাবে পুরোনো ঐতিহ্যশালী জমিদার পরিবারগুলির অনেকের হাত থেকেই জমির মালিকানা চলে গিয়েছিল। সূর্যাস্ত আইনের শিকার জমিদারিগুলি একের পর এক বিক্রি হয়ে গেল। কিন্তু জমিদারি হস্তান্তরের ফলে নতুন জমিদার হয়ে বসেছিল কারা? অর্থাৎ জমিদারিগুলি কারা কিনেছিল? জেমস্ মিল এরকম একটি ধারণার আমদানি করেছিলেন যে সূর্যাস্ত আইনের ফলে সব থেকে লাভবান হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। তারাই রাজস্ব দিতে ব্যর্থ পুরোনো জমিদারদের কাছ থেকে জমিদারিগুলি কিনেছিল। কিন্তু নতুন জমিদারদের পূর্বতন আর্থ-সামাজিক অবস্থান আলোচনা করে দেখা যায় যে এই বক্তব্যে আংশিক সত্যতা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই পুরোনো জমিদারিগুলি কেনেনি। সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ রাজস্ব দিতে ব্যর্থ জমিদারিগুলি কিনে নতুন জমিদার হয়ে বসেছিল। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম *The Permanent Settlement of Bengal* গ্রন্থে হিসেব দিয়ে দেখিয়েছেন যে—কেবলমাত্র ব্যবসাদার নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারের আমলা, কর্মচারী, পেশাদার মানুষ, সুদের কারবারি এবং অন্যান্য জমিদারও সূর্যাস্ত আইনের ফলে হাতছাড়া জমিদারিগুলি নিলামে কিনে নিত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ঢাকার নবাব পরিবার ও নদিয়া জেলার রানাঘাটের পালচৌধুরি পরিবারের প্রতিষ্ঠাতারা, দিনাজপুরের বৈদ্যনাথ মণ্ডল এবং নন্দীরা—সকলেই ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রে দেখা যায় জেমস্ মিলের বক্তব্যে কিছুটা সত্যতা আছে। তবে যে সমস্ত ব্যবসায়ী পরিবারের লোকেরা সাধারণত বিভিন্ন জমিদারের বা কোম্পানি সরকারের আমলা হিসাবে কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যেই নতুন জমিদারি ক্রয় করার প্রবণতা ছিল বেশি। একথাও মনে রাখা দরকার যে বাণিজ্যিক সংকটের সময় অর্থাৎ যখন বাণিজ্যিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিত, তখনই বণিকগোষ্ঠী জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে জমিদারি কিনতে উৎসাহিত হতেন। এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি এবং কলকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরিবারগুলির উত্থান। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীর রাজপরিবারের পূর্বপুরুষদের আয়ের উৎস ছিল নানাবিধ—সুদের কারবার, ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকা, হুগলিতে চুঙ্গি কর আদায় করা প্রভৃতি। আয়ের এই উৎসগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রেশম ব্যবসা। কান্দীর রাজারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমির মালিক হয়েছিলেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুর এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারগুলি, কাশিমবাজারের নন্দী পরিবার, ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবার, কলকাতার শোভাবাজারের দেব পরিবার—এরা সকলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর নিলামে জমি কিনে জমির মালিক হয়ে বসেছিল। এই পরিবারগুলির কোনোটিই কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই তাদের আয় বৃদ্ধি

ঘটায়নি। দর্পনারায়ণ ঠাকুর চন্দননগরের ফরাসি কুঠিতে এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাবা জেলা কালেক্টরেট অফিসে চাকরি করতেন। ১৭৯৩ সালের পরপরই যেসব পুরোনো জমিদারি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, সেগুলির ক্রেতারা ছিল মূলত পুরোনো জমিদারের অধীনস্থ আমলা বা কর্মচারী। ১৮০২ সাল বীরভূমের কালেক্টর একটি প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—জমিদারিগুলির নতুন ক্রেতাদের মধ্যে অধিকাংশই বীরভূমের রাজার পূর্বতন কর্মচারী। বাকিরা হয় ব্যবসাদার নয় তো বিভিন্ন জমিদারের অধীনস্থ আমলা। ১৮১০ সালে দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট দেন—নিলামে জমিদারি ক্রেতারা অনেকেই ছিলেন পুরোনো জমিদার পরিবারগুলির দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল। বাখরগঞ্জের চন্দ্রদ্বীপ জমিদারি এবং রাজশাহি জমিদারির গোটাটাই কিনে নিয়েছিল সংশ্লিষ্ট জমিদার পরিবারের উকিলেরা। তারা তাদের প্রভুদের প্রতারিত করে জমিদারির মালিক হয়ে বসেছিল। সমস্ত সফল ব্যবসায়ীই যে সে সময় সূর্যাস্ত আইনের শিকার জমিদারিগুলি কিনে নিয়ে রাতারাতি জমিদার হয়ে বসেছিল—এ বক্তব্যও আদৌ সঠিক নয়। কলকাতার শেঠ এবং বসাকেরা, রামদুলাল দে ও রাধামাধব ব্যানার্জি বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রচুর মুনাফা করলেও জমিদারি কেনার ব্যাপারে তাঁরা কোনো উৎসাহ দেখাননি। ওড়িশায় নিলামে জমি কিনে যারা রাতারাতি নতুন জমিদার হয়ে বসেছিল তারা অধিকাংশই ছিল রাজস্ব দপ্তর বা বিচার দপ্তরে কর্মরত আমলা। কোন্ জমিদারি বিক্রি হবে এবং জমির প্রকৃত মূল্য কত—এই দুটি বিষয় তাদের জানা থাকত। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকার ফলে উপরোক্ত আমলাদের জমিদারি কিনতে অনেক সুবিধা হয়েছিল। দেখা যায় যে, ওড়িশায় ১৮০৪ সাল থেকে ১৮২১ সাল পর্যন্ত জমির বাজার নিয়ন্ত্রণ করত বাঙালিরা। ঐতিহাসিক বিনয়ভূষণ চৌধুরী দেখিয়েছেন—ওড়িশায় ১৮১৭ সালে ২৩২টি বাঙালি জমিদার পরিবারের মধ্যে ৬১·৫ শতাংশই আগে সরকারি আমলা হিসাবে কাজ করত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমির বাজারকে এক ব্যাপকতর ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবাধীন এলাকাগুলিতে দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল—বাজারি অর্থনীতির অনুপ্রবেশ এবং কৃষির বাণিজ্যিকরণ (commercialisation of agriculture)। রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত বোঝা কৃষির বাণিজ্যিকরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। অতিরিক্ত খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকেরা ক্রমেই বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। মহাজনেরা নিজেদের পছন্দমতো শস্য ফলাতে অধমর্ণ কৃষকদের বাধ্য করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বর্ধমান ও নদিয়ার চাষিরা নীল, আখ, তুলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল ফলাতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের ওপর খাজনার হার আরও বাড়ানো হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বাংলাদেশের কৃষির চেহারা অনেকটাই পালটে যেতে থাকে। এই সময় থেকে জমিদারেরা লাভবান হতে শুরু করে। সুগত বোস দেখিয়েছেন—১৭৯৩ সালে জমিদারের প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা। ১৮৭৬ সালে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধির কারণ ছিল দ্বিবিধ—এক, কৃষির

Scanned with CamScanner

বাণিজ্যিকরণের ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল এবং নীল, তামাক, তুলা প্রভৃতি [illegible] সাহায্যে কৃষির সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। খ্রী. ১৮৫০ সালের পর [illegible] রায়তদের ওপর খাজনার হার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয়েছিল। থেকে অস্থায়ী বা পাহিকাস্ত রায়তদের [illegible]। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল বাংলার কৃষকশ্রেণীকে। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকেই কৃষকদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার সময় আমিলদারেরা এবং ওয়ারেন হেস্টিংসে প্রবর্তিত পাঁচশালা বন্দোবস্তের সময় ইজারাদারেরা রায়তদের ওপর অকথ্য উৎপীড়ন চালিয়ে যত বেশি সম্ভব খাজনা আদায় করত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলনও তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটায়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় কোম্পানি সরকারের সঙ্গে জমিদারদের যেমন চুক্তি হয়েছিল, সেরকম কোনো চুক্তিতে কিন্তু জমিদারেরা রায়তদের সঙ্গে আবদ্ধ হয়নি। ফলে জমিদার রায়তদের ওপর খাজনার হার নির্দ্বিধায় বৃদ্ধি করত। বর্ধিত খাজনার চাপে জর্জরিত রায়তেরা খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হত। ১৭৯৯ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংশোধিত আইনের ৭ নম্বর রেগুলেশনে বলা হল—খাজনা দিতে ব্যর্থ রায়তকে জমিদার ইচ্ছেমতো জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে। এই আইন রায়তকে তার জমিদারের করুণার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—এই আইন জমিদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। সিরাজুল ইসলামের মতে এই আইন ছিল ব্রিটিশ ভারতের 'প্রথম কালা কানুন'। জমিদারেরা প্রায়ই জমির আসল রায়ত বা খুদকাস্ত রায়তদের জমি থেকে উৎখাত করে অস্থায়ী বা পাহিকাস্ত রায়তদের বসাত। পত্তনি ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর জমিতে যখন বিভিন্ন স্তরে উপস্বত্ব বসল তখন কৃষকদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নির্ধারিত খাজনার বাইরেও নানা ধরনের বেআইনি কর এবং আবওয়াব কৃষকদের ওপর বসানো হয়েছিল। ফলে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ এবং অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল, যার অনিবার্য পরিণতি ছিল উনবিংশ শতকের বাংলায় একের পর এক জঙ্গি কৃষক বিদ্রোহ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে এক নতুন রাজনৈতিক মিত্র লাভ করেছিল। রজনী পাম দত্ত তাঁর *India Today* গ্রন্থে বলেছিলেন—ইংরেজ শাসকেরা ইংল্যান্ডের ভূস্বামী শ্রেণীর অনুকরণে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের স্তম্ভ হিসাবে এক নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর তৈরি করার উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন। গণ-বিক্ষোভের আঘাত থেকে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করার জন্য এই রাজনৈতিক মিত্রতার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই ধরনের মতামতের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলেছেন অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী। তিনি বলেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলনের সময় কোম্পানির সামনে গণ-বিক্ষোভ জনিত কোনো বিপদের অস্তিত্বই ছিল না। তাই তিনি নতুন ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি বা কৃষক বিদ্রোহ দমনের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনার মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাননি। কিন্তু সুপ্রকাশ রায় তাঁর *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে—ক্রমবর্ধমান গণ-বিদ্রোহের আঘাত থেকে একটি নবপ্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শাসনকে রক্ষা করার জন্য একদল কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন

সমর্থক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নিজেদের [illegible] অবাধ অধিকার জমিদার শ্রেণীর হাতে অর্পণ করেছিল। [illegible] রায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করে লিখেছেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ভারতীয় জমিদারদের এক কৃষক বিরোধী জোট গড়ে উঠেছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত অশোক মিত্র (আই. সি. এস) ভারতের আদমশুমারি বা Census লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—কোম্পানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে একটি কৃষিনির্ভর দেশ হিসাবে রেখে দিতে চেয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকে অবহেলা করার একটা প্রবণতা এই বন্দোবস্তে ছিল। ইংরেজ শাসকেরা বুঝেছিলেন যে শিল্প ও বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ ভারতের বাজারে ইংল্যান্ড থেকে শিল্পজাত পণ্য আমদানি করা অনেক সহজ হবে। অশোক মিত্রের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ 'ভিত্তিহীন' বলে নস্যাৎ করেছেন ঐতিহাসিক বিনয় চৌধুরী। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পেছনে যে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও কাজ করেছিল—একথা মোটেই অস্বীকার করা যাবে না। কর্নওয়ালিস নিজেই লিখেছিলেন—আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই দেশের ভূস্বামীদের আমাদের সহযোগী করে নিতে হবে। কোম্পানির এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়েছিল বলা চলে। উনবিংশ শতকের বাংলার সশস্ত্র প্রতিরোধের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে বাংলার জমিদার শ্রেণী ইংরেজ শাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছিল।

প্রখ্যাত পণ্ডিত রমেশ দত্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Economic History of India*-তে একটি সুদক্ষ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। রমেশ দত্তের ভাষায়—"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতাভুক্ত বাংলায় ১৭৯৩ সালের পর একটিও মানবজীবন বিনষ্টকারী দুর্ভিক্ষ হয়নি। .... লর্ড কর্নওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল ভারতে ব্রিটিশ জাতি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ ও সফল পদক্ষেপ" (Since 1783 there has never been a famine in permanently settled Bengal which has caused any serious loss of life .... Lord Cornwallis's Permanent settlement of 1793 is the wisest and most successful measure which the British nation has ever adopted in India.)। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনা এই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থে আংশিক সাফল্য এনেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু এই ব্যবস্থা বাংলার রায়তদের বা সার্বিকভাবে বাংলার কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে কর্নওয়ালিসের দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছিল। প্রথমত, কোম্পানির সরকার ভূমিরাজস্ব খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক মিত্রতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু 'উৎপাদনশীল নীতি' (productive principle) কথাটিকে কর্নওয়ালিস ও তাঁর সহযোগীরা ১৭৯৩ সালের আগে ব্যাপক প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উৎপাদনশীল নীতির পরিপন্থী

Scanned with CamScanner

হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই আশা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় কৃষিবিপ্লব নিয়ে আসবে। কিন্তু তা আসেনি। উনবিংশ শতকের জমিদারদের আয় বেড়েছিল মূলত রায়তদের ওপর চাপানো বর্ধিত খাজনার জন্য। কৃষির উন্নতির ফলে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পায়নি। কৃষি থেকে আসা আয় জমিদারেরা বিলাস বৈভব বা দান খয়রাতিতে ব্যয় করত ; কৃষি বা শিল্পের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হয়নি। জমিদারদের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঙ্গলজনক হয়েছিল। একদিকে তাদের আয় বৃদ্ধি হয়েছিল, অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যাপারে বাংলার জমিদারেরা ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাই ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত এক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির দ্বারা বাংলার জমিদারদের আচ্ছন্ন করেছিল।

৬.৫.৫ মাদ্রাজের রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত

যদিও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫০ সাল নাগাদ-ই মাদ্রাজের আশপাশের অঞ্চল দখল করেছিল এবং ১৭৬৫ সাল নাগাদ বিশাখাপত্তনম, গঞ্জাম, কৃষ্ণা ও গোদাবরী নিয়ে গঠিত 'উত্তর সরকার' (northern sirkars) অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল, এইসব অঞ্চল থেকে প্রত্যক্ষ রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই অঞ্চলে একটি গোটা গ্রামের মিরাসদারের সঙ্গে কোম্পানি ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তুলেছিল। 'মিরাস' কথার অর্থ ছিল জমির ওপর বংশানুক্রমিক স্বত্ব। ১৭৯২ সালে টিপু সুলতানের কাছ থেকে বরামহল ও সালেম জেলা দুটি ছিনিয়ে নেবার পর কোম্পানি ঐ অঞ্চলে একটি সুবিন্যস্ত ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছিল। প্রত্যেক রায়তের নিজস্ব জমি জরিপ করে এবং তার উৎপাদিকা শক্তি পরীক্ষা করে ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত করা হয় এবং রায়তদের কাছ থেকে কোম্পানি সরাসরি ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করে। এই রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত গড়ে তোলার কৃতিত্ব মূলত, কর্নেল আলেকজান্ডার রিড ও টমাস মানরোর, বরামহল অঞ্চলে ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত গড়ে উঠেছিল ১৭৯২ সাল থেকে ১৭৯৮ সালের মধ্যে। কোয়েম্বাটুরে ১৭৯৯ সালে, নিজাম কর্তৃক ইংরেজদের ছেড়ে দেওয়া অঞ্চলসমূহে (ceded territories) অর্থাৎ বেলারি, অনন্তপুর, কুর্নুল ও কুদাপ্পা অঞ্চলে ১৮০০ সালে এবং নেল্লোর, উত্তর ও দক্ষিণ আর্কট, চিত্তুর, মাদুরা, রামনাদ প্রভৃতি কর্ণাটকী জেলাগুলিতে ১৮০১ সালে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল।

উনবিংশ শতকের প্রথম দুটি দশকে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নানারকম অসফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তন চলেছিল। শেষপর্যন্ত টমাস মানরো যখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নর ছিলেন (১৮১৯-১৮২৭), তখনই তিনি ঐ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেন। একই সময়ে বম্বে প্রেসিডেন্সির গভর্নর এলফিনস্টোন মারাঠা শক্তির পরাজয়ের পর পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রচলন করেন।

মাদ্রাজ অঞ্চলে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত মানরো কর্তৃক চূড়ান্তভাবে চালু করার আগে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল, তা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের পরই কলকাতার গভর্নর জেনারেল

এবং লন্ডনের কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ মাদ্রাজে চিরস্থায়ী জমিদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু 'উত্তর সরকার' অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র কোথাওই এ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি। 'উত্তর সরকার' অঞ্চলে জমিদারি ব্যবস্থা আগে থেকেই চালু ছিল। ১৭৯৯ সালে দক্ষিণ ভারতে চিরস্থায়ী জমিদারি ব্যবস্থা প্রচলনের ব্যাপারে তোরদার নির্দেশ পাঠানো হয়। ১৮০২ সালের ২৫ নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী ১৮০২ থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে চিংগলপুট, সালেম, চিত্তুর, রামনাদ, দিন্দিগুল প্রভৃতি অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। জমিদার, পলিগার, স্থানীয় প্রধান ও মাট্টাদারদের সঙ্গে কোম্পানি চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলে। হাভেলি জমিগুলি অর্থাৎ যে জমি কোম্পানির সরকার পুরোনো মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে সরাসরি অধিগ্রহণ করেছিল সেগুলি কতকগুলি ভাগে বা মাট্টায় বিভক্ত করে সর্বোচ্চ নিলামদারের কাছে বিক্রি করা হল। জমির এই নতুন মালিকেরা জমির ওপর চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করে। এদের বলা হত মাট্টাদার। এদের সঙ্গে চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় এবং এদের জমিদারিকে বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য করা হয়। বিগত ১৩ বছরের গড় উৎপাদনের ৩৩ শতাংশ ভূমিরাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত করা হয়। বাস্তবে দেখা গেল—প্রকৃত উৎপাদক বা কৃষকদের ভাগে আগে আসত সমগ্র উৎপাদনের ৫০ শতাংশ, কিন্তু নতুন বন্দোবস্ত কার্যকরী করার পর জমিদারি অত্যাচারের ফলশ্রুতি হিসাবে সেই ভাগের হ্রাস পেয়ে ২০ থেকে ৩৩ শতাংশের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক ধর্মা কুমার লিখেছেন—অধিকাংশ জেলাতেই এই ব্যবস্থা অসন্তোষের সঞ্চার করেছিল। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে জমির মালিকেরা প্রায়ই রায়তদের ওপর চরম উৎপীড়ন চালিয়ে কম সময়ের মধ্যে যত বেশি সম্ভব খাজনা আদায় করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও জমির মালিকেরা নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব সরকারকে সময়মতো দিতে পারত না। সময়মতো রাজস্ব দেবার ব্যর্থতার পরিণতি হিসাবে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল বরামহলের অধিকাংশ জমিই সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়েছে। ব্যাডেন পাওয়েল লিখেছেন—মাট্টাদারেরা সালেম জেলাতে রায়তওদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে বেআইনি খাজনা আদায় করত এবং বহু রায়তকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করেছিল। যদিও ১৮২৮ সালে বেন্টিঙ্ক বলেছিলেন জমিদারি ব্যবস্থা সরকারের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন, তা সত্ত্বেও বেশ কিছু অঞ্চলে এই ব্যবস্থা থেকে গিয়েছিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু হয়ে গেলেও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে জমিদারি বন্দোবস্ত টিকে ছিল। দক্ষিণ ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত চালু হয়নি, সে-সব অঞ্চলে গ্রামীণ ইজারাদারি ব্যবস্থা (village lease system) চালু করা হয় ১৮০৮ সালে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কোম্পানি গ্রামপ্রধানদের সাথে বা সাধারণ গ্রামবাসীদের সাথে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থায় রাজস্বের বোঝা ছিল অত্যধিক। কুদাপ্পার জেলা ম্যানুয়ালে বলা হয়েছিল—কোম্পানি এই অঞ্চলে লুণ্ঠনের নীতি গ্রহণ করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ আর্কট এবং কোয়েম্বাটুরে নির্ধারিত রাজস্বের হার ছিল অত্যন্ত বেশি। তাই গ্রামীণ ইজারাদারি ব্যবস্থা সফল হয়নি। ১৮২৪ সালে নেল্লোরের কালেক্টর একটি প্রতিবেদনে বলেন—এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসাবে এলাকায় কৃষির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

Scanned with CamScanner

১৮১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ একটি ডেসপ্যাচের মাধ্যমে নির্দেশ দেয় যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করতে হবে। গ্রামীণ ইজারা ব্যবস্থায় চুক্তির সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেই সে-সব অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা কার্যকরী করা হবে। মাদ্রাজে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রচলনের পেছনে মূল কারণ ছিল কোম্পানির রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। টমাস মান্‌রো ১৮১৯ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নর নিযুক্ত হন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের প্রচলন ঘটে। অধ্যাপক নীলমণি মুখোপাধ্যায় তাঁর *The Ryotwari System in Madras* গ্রন্থে দেখিয়েছেন টমাস মান্‌রো একজন জেলাশাসকের পদ থেকে কীভাবে মাদ্রাজের গভর্নর হওয়া পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এরিক স্টোকস্ মনে করেন মূলত দুটি কারণে মান্‌রো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রথমত, মান্‌রোর উদ্দেশ্য ছিল অসময়ের জন্য রাষ্ট্রের হাতে করযোগ্য একটি তহবিল সঞ্চিত রাখা। দ্বিতীয়ত, পতিত জমিগুলির ওপর থেকে তিনি রাষ্ট্রের রাজস্ব অধিকার ছাড়তে রাজি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কর্নওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার সময় পতিত জমিগুলিকে বিভিন্ন জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করে নেন।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের মূল কথা ছিল রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির সরকারের সঙ্গে রায়তের সরাসরি চুক্তি। কিন্তু রাজস্ব নির্ধারণের বিষয়টি ছিল বেশ জটিল। উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদিত পণ্যের বাজার-দর, বেতন হিসাবে কৃষক পরিবারের কতজনের কয়দিনের খরচ শ্রমের মূল্য ধরা হবে, কৃষিকাজের খরচ, স্থায়ী কৃষি পুঁজি অর্থাৎ লাঙল, বলদ ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি (depreciation) বাবদ কৃষকের বাৎসরিক খরচ— প্রভৃতি হিসাব করা হবে। প্রথম দুটি থেকে পাওয়া যাবে মোট আয়। অন্যগুলি থেকে উৎপাদনের খরচ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। উৎপাদনের ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তার অর্ধেক বা ৫০ শতাংশ হবে নির্ধারিত ভূমিরাজস্ব। এটাই ছিল মাদ্রাজের রায়তওয়ারি ব্যবস্থা অনুযায়ী ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের স্বরূপ। এক্ষেত্রেও নির্ধারিত রাজস্বের হার ছিল যথেষ্ট বেশি। তাছাড়া উপরোক্ত হিসাবগুলি প্রতি বছর খতিয়ে দেখা হত এবং সেই অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করে রায়তকে পাট্টা দেওয়া হত। তাই এরিক স্টোক্‌স সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন—রায়তওয়ারি ব্যবস্থা একটি বাৎসরিক বন্দোবস্তে পরিণত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব খাতে চাহিদা হয়ে উঠেছিল দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় এক জেলা থেকে অন্য জেলাতে, এমনকি গ্রামে গ্রামেও রাজস্ব নির্ধারণের তারতম্য ঘটত। অনেক এলাকার রায়তেরা মোট উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র ভোগ করতে পারত। তাছাড়া রায়তদের নগদ টাকায় ভূমিরাজস্ব দিতে হত বলে তারা নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। ধর্মা কুমার বলেছেন—১৮২৫-২৬ ও ১৮৫৩-৫৪ সাল নাগাদ কৃষিপণ্যের মূল্য অত্যধিক হারে হ্রাস পাবার ফলে কৃষকদের নগদ মূল্যে কর দিতে খুবই অসুবিধা হয়েছিল এবং রাজস্বের বোঝা তাদের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৪ সালে একটি সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে উত্তর আর্কটের অন্তর্গত এমন কিছু গ্রাম ছিল যেখানে রায়তরা রাষ্ট্রের চাহিদা রাজস্ব মিটিয়ে দেবার পর মোট উৎপাদনের মাত্র ২৫ শতাংশ নিজেদের ঘরে তুলতে পারত।

কৃষকগুলি জেলায় রাষ্ট্র নির্ধারিত রাজস্বের হার এতটাই বেশি ছিল যে সেখানে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচে নেমে গিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের ভোগের জন্য যে কৃষিজ পণ্য মজুত রাখত, রাজস্ব মেটানোর তাগিদে তারা সেই পণ্য বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য হত। ফলে রায়তদের ঘরে খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া রায়তদের কাছ থেকে নগদ টাকায় রাজস্ব আদায় করত একদল রাজকর্মচারী। এদের অধিকাংশই ছিল অসৎ এবং এরা নির্ধারিত রাজস্বের বাইরেও অতিরিক্ত টাকা রায়তদের থেকে বলপূর্বক আদায় করে নিত। ফলে রায়তদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। মান্‌রোর পরবর্তীকালে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। সুতরাং রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে প্রকৃত উৎপাদক বা রায়তদের অবস্থা ভালো হয়েছিল, একথা কখনোই বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কোম্পানির সরকারের কোনো উৎসাহ ছিল না। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—কীভাবে ভূমিরাজস্ব খাতে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যায়। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার একটাই তফাত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন রায়তেরা বিভিন্ন স্তরের ভূমিস্বত্বভোগীদের দ্বারা উৎপীড়িত বা শোষিত হতেন। কিন্তু রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় রায়তদের রাজস্বের চাপে জর্জরিত করে তাদের ওপর উৎপীড়ন চালানোর একমাত্র অধিকার ছিল কোম্পানির সরকার ও তার রাজকর্মচারীদের হাতে।

৬.৫.৬ বোম্বাইতে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর ১৮১৮ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পশ্চিম ভারতে পেশবার রাজ্য দখল করে নেয়। এলফিনস্টোনের ওপর নব-বিজিত অঞ্চলের শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৮১৯ সালে এলফিনস্টোন তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস (ময়রা)-এর কাছে একটি মূল্যবান প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনটির নাম ছিল "Report on the Territories Conquered from the Peswa"। ঐ বছরই বম্বের গভর্নর নিযুক্ত হবার পর তিনি সমগ্র বিজিত অঞ্চল জরিপ করে ভূমিরাজস্ব হিসাব করেন। মারাঠা অঞ্চলে আগে ভূমিরাজস্বের ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসিত গ্রামীণ সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। গ্রামপ্রধান বা মিরাসদার কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সরকারকে রাজস্ব দিত। এলফিনস্টোন গ্রামপ্রধান বা মিরাসদারদের স্বীকৃত অধিকার রক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। অথচ তিনি পুরাতন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বহাল রাখতে চাননি। তিনি গ্রামীণ সমাজের (village community) অস্তিত্বকে বজায় রেখে তার সঙ্গে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের নীতির সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের সমন্বয় সাধন বাস্তবসম্মত ছিল না। রায়তওয়ারি ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। ইংরেজ কর্মচারীরা বা কালেক্টরেরা প্রায়ই মিরাসদারদের অবিশ্বাস করত। ফলে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিল। তাছাড়া নির্ধারিত ভূমিরাজস্বের হারও ছিল অত্যধিক। কারণ সম্পূর্ণ অসত্য ও অসম্ভব বাড়াবাড়ি রকমের উৎপাদিত শস্যের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল। অত্যধিক করভারে জর্জরিত কৃষকেরা মহাজনদের দেওয়া

Scanned with CamScanner

ফসলের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলস্বরূপ ঋণ নিতে গিয়ে কৃষকদের অর্থনৈতিক সংকট চরমে উঠেছিল। মহাজনী শোষণের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য কোম্পানির সরকার অবশ্য আইন প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু আইন করে মহাজনদের প্রভাব খর্ব করা যায়নি। ১৮২৭ সালে এলফিনস্টোন যখন অবসর নিলেন, তখন পর্যন্ত পশ্চিম ভারতে কোনো সুবিন্যস্ত ভূমিব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এবং সরকার কোনো নির্দিষ্ট রাজস্ব নীতি গড়ে তুলতে পারেনি।

কিন্তু পরের তিনজন সুদক্ষ রাজস্ব অফিসারের কৃতিত্বে বোম্বাইয়ে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এঁরা হলেন—আর. কে. প্রিঙ্গল, ওয়ার্ড উইনগেট এবং গোল্ডস্মিথ। উইনগেট ও গোল্ডস্মিথের উদ্যোগে ১৮৩৫ সালে নতুন করে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর পর শেষপর্যন্ত ১৮৪৭ সালে কতকগুলি নীতি গ্রহণ করা হয়। বোম্বেতেও মাদ্রাজের মতোই রায়তদের কাছ থেকে সরাসরি ভূমিরাজস্ব আদায়ের নীতি গৃহীত হয় অর্থাৎ রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু করা হয়। কিন্তু মাদ্রাজের রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। অর্থাৎ রায়তদের জমিতে মোট উৎপাদন ও খরচের হিসাবের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হয়নি। জমির উৎকর্ষতা এবং উৎপাদিত শস্যের বাজার-দামের ভিত্তিতে রায়তদের জমির ওপর রাজস্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। বোম্বেতেও মাদ্রাজের মতোই ত্রিশ বছরের জন্য রাজস্ব নির্ধারিত হত।

কিন্তু এই ব্যবস্থা রায়তদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটাতে পারেনি। এখানেও অতিরিক্ত রাজস্ব নির্ধারণের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজ কর্মচারীরা সম্পূর্ণ আন্দাজে জমির গুণগত মান বা উৎকর্ষ বিচার করতেন। সেই বিচারের ওপর ভিত্তি করেই রাজস্ব নির্ধারিত হত। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই রাজস্ব নির্ধারণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং যথেষ্ট বেশি। এই অত্যধিক পরিমাণ রাজস্ব দিতে রায়তরা যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হত। বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদন থেকে একথা স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো পশ্চিম ভারতেও খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। তাছাড়া মারাঠা অঞ্চলের রায়তরা জমির ওপর তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার হারিয়েছিল। পূর্বতন ব্যবস্থায় অর্থাৎ পেশবাতন্ত্রের যুগে কৃষক বা মিরাসদারেরা জমির ওপর বংশানুক্রমিক মালিকানা ভোগ করত। বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিকর দিত। কিন্তু নতুন ব্যবস্থার প্রচলন কৃষককে তার জমির ওপর বংশানুক্রমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। কোনো কৃষক ভূমিরাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে, তার জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে—এই নিয়ম চালু করা হয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তুলনায় রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ছিল অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা; কারণ এই ব্যবস্থা কিছুটা পরিমাণ হলেও রায়তদের স্বার্থরক্ষা করেছিল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইতিপূর্বেই দেখা গেছে যে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত জমিতে কৃষক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করেনি, উপরন্তু কৃষকদের ঐতিহ্যগত পুরাতন অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের অধীনস্থ রায়তেরা অচিরেই উপলব্ধি করেছিল

যে অনেকগুলি জমিদারের পরিবর্তে তারা এক বৃহৎ জমিদারের দ্বারা শোষিত হয়েছে—সেই বৃহৎ জমিদার হল রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে সরকারীভাবে ইংরেজ সরকার প্রকাশ্যেই দাবি করেছিল যে তারা রায়তের কাছ থেকে যে ভূমিরাজস্ব নিত, তা কর (tax) ছিল না, ছিল খাজনা (rent)। তাছাড়া অন্য কতকগুলি বিষয়ও রায়তের জমির ওপর অধিকার বাস্তবে নাকচ করে দিয়েছিল। প্রথমত, অধিকাংশ এলাকাতেই নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশি। মাদ্রাজ ও বোম্বেতে রাষ্ট্রের চাহিদা মেটাতে গিয়ে রায়তরা অত্যন্ত দরিদ্র জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে বলা হয়েছিল সরকার ইচ্ছেমতো ভূমিরাজস্বের হার বৃদ্ধি করতে পারবে। তৃতীয়ত, খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত কারণে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও রায়তদের ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে কোনোরকম ছাড় দেওয়া হত না। এ থেকে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার যে চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল এই ব্যবস্থা কৃষকের স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে তার সর্বনাশ ঘটিয়েছিল। ইংরেজ শাসকদের লক্ষ্য ছিল ভূমিরাজস্ব বাবদ সরকারের আয় বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যপূরণে তারা সফল হয়েছিল সন্দেহ নেই।

৬.৫.৭ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা বা মহালওয়ারি বন্দোবস্ত

১৮০১ থেকে ১৮০৩ সালের মধ্যে উত্তর ভারতে ইংরেজরা এক বিস্তীর্ণ এলাকা লাভ করেছিল। এই এলাকার একাংশ তারা যুদ্ধ করে জয় করে নিয়েছিল। অবশিষ্ট অংশ ভারতীয় শাসকরা তাদের ছেড়ে দিয়েছিল। ১৮০১ সালে অযোধ্যার নবাব ইংরেজদের কাছে বেরিলি, মোরাদাবাদ, কানপুর, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, এটাওয়া প্রভৃতি অঞ্চল ছেড়ে দেন। ১৮০৩ সালে সিন্ধিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে ইংরেজরা উত্তর ও দক্ষিণ সাহারানপুর, আলিগড় ও আগ্রা দখল করে। একই বছর পেশবা বুন্দেলখণ্ড ইংরেজদের হাতে অর্পণ করে। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ নিয়ে গড়ে ওঠা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বলা হত। এই অঞ্চল লাভ করার পরই ইংরেজরা বাংলার অভিজ্ঞতা থেকে এখানেও চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ১৮০২ সালে ওয়েলেসলি তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে—জমিদারেরা যদি সঠিক ও যুক্তিগ্রাহ্য পরিমাণে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হন, তবে তাঁদের সঙ্গেই ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে হবে। ওয়েলেসলি যখন এই নির্দেশ পাঠান, তখন ইংরেজদের ভূমিরাজস্ব হিসাব বা ধার্য করার মতো সম্যক জ্ঞান বা সুদক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারী, কিছুই ছিল না। তাছাড়া এই অঞ্চলে বৃহৎ জমিদারের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ১৮০১ সালে উত্তর ভারতের ইংরেজ অধিকৃত স্থানের ২০ শতাংশেরও কম জমি তালুকদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। যেসব অঞ্চলে বড়ো তালুকদার ছিল না সেসব অঞ্চলে ইংরেজ কোম্পানি রাজস্ব ইজারাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেছিল। রোহিলখণ্ডে নির্ধারিত ৪৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের মধ্যে ৪২ লক্ষ টাকাই ছিল রাজস্ব ইজারাদারদের হাতে। এটাওয়া জেলার সমগ্র রাজস্ব ১৭ জন ইজারাদারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সবথেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সরকার কর্তৃক অত্যন্ত উচ্চহারে ভূমিরাজস্ব ধার্য করা। এই অঞ্চলের ভূমিজ সম্পদ সম্পর্কে ইংরেজদের উচ্চ ধারণা ছিল।

Scanned with CamScanner

হত, তাই তারা গোপনে তাদের উৎপাদনের একটা অংশ দেশীয় বণিকদের বিক্রি করে দিত। কিন্তু কোম্পানির সরকার একাধিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এবং সেগুলিকে কঠোরভাবে বলবৎ করে মোলুঙ্গিদের এই গোপন ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। লবণের একচেটিয়া কারবারের অসম্ভব কুফল ছিল মোলুঙ্গিদের দারিদ্র্যপীড়িত শ্রীহীন অবস্থা। ১৮৩২ সালে ক্রফোর্ড (Crawfurd) একটি প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—লবণ শ্রমিকদের দাসত্বের স্তরে রেখে দেওয়া হয়েছিল—প্রতিটি শ্রমিক সারাজীবনের জন্য কোম্পানির ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল (Salt labourers were practically in a state of slavery—every man of them being in debt to the Company inextricably and for life.)।

এজেন্সি ব্যবস্থার অধীনে আফিমের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে কোম্পানির এজেন্টরা আফিম উৎপাদনের জন্য রায়তদের অগ্রিম টাকা দাদন হিসাবে দিত। তারপর সেই কাঁচা আফিমকে কোম্পানির কারখানাগুলিতে তৈরি মালে পরিণত করা হত। এই প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ। কোন্ রায়তের হাতে কতটা জমি আছে, সেই অনুযায়ী রায়তদের দাদন দেওয়া হত। এই আফিম চাষিরা এতটাই দরিদ্র ছিল যে দাদন নেবার পরও তাদের উদ্দেশ্য থাকত তাদের উৎপাদিত আফিমের একাংশ বেআইনিভাবে বিক্রি করা। রায়তরা কোম্পানির এজেন্টের কাছ থেকে আফিমের যে মূল্য পেত তার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। প্রতি সের (৮০ সিক্কা) আফিমের বিনিময়ে তাঁরা মাত্র দুটাকা পেতেন। এজেন্টরা অনেক সময় আফিমের গুণগত মান নিকৃষ্ট, এই অজুহাতে রায়তদের প্রাপ্যমূল্যের অর্ধেক টাকা দিত। তাছাড়া আফিম কারখানার নিম্নতন কর্মচারীরা দরিদ্র রায়তদের ওপর নানাভাবে উৎপীড়ন চালাত। তারা আফিম ওজন করার সময় অসৎ উপায় গ্রহণ করত এবং রায়তরা আফিম বিক্রি করে যে সামান্য দাম পেত তার থেকে এই কর্মচারীরা বলপূর্বক সেলামি আদায় করত। ১৮১১ সালের ৩০শে জুলাই "বোর্ড অফ্ ট্রেড"-এর কাছে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিহারের সারন অঞ্চলের আফিম চাষিরা বলেছিলেন—তারা যদি ১ মন দশ সের ওজনের আফিম ছাপড়ায় অবস্থিত কোম্পানির আফিম কারখানায় নিয়ে যেত, তবে গোমস্তা ও নিম্নতন কর্মচারীরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তার ওজন নির্ধারণ করত ৩৫ সের। তাদের প্রাপ্য ১০০ টাকার পরিবর্তে তাদের মাত্র ৭০ টাকা দেওয়া হত। আবার সেই টাকার থেকে কর্মচারীরা ৯ টাকা সেলামি হিসাবে রেখে দিত। আফিম চাষিদের এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার নির্ভর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শৃঙ্খল কীভাবে তাদের নিষ্পেষিত করেছিল।

মোলুঙ্গি এবং রায়তদের মতো সুতি ও রেশম তাঁতিদের জীবনেও কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য মারাত্মক কুফল ডেকে এনেছিল। তাঁতিরা অগ্রিম টাকা নিয়ে কাজ করত বলে তারা কোম্পানির করুণার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কোম্পানি তাঁতিদের কাছ থেকে বস্ত্র সংগ্রহ করার অনেক আগেই মূল্য নির্ধারণ করে দিত এবং বলে দিত কী পরিমাণ বস্ত্র কোম্পানি কিনবে। কোম্পানি নির্ধারিত মূল্যের পরিমাণ ছিল খুব কম। মূল্য নির্ধারণের সময় কাঁচামাল সংক্রান্ত খরচ হিসাব করা হত না। তাছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা, উৎকৃষ্ট মানের পণ্য সরবরাহ করা হয়নি, এই অভিযোগে প্রায়ই তাঁতিদের টাকা কেটে রাখত। অন্য

কোনো বণিক যদি তাঁতিদের বেশি দামও দিত, তা সত্ত্বেও তারা সেই বণিকদের কাছে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারত না। কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তাঁতিদের কেবল কোম্পানির কাছেই তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করত। তাই তাঁতিরা প্রায়ই কোম্পানির হয়ে কাজ করার বিষয়ে তীব্র অনীহা প্রকাশ করত। নদিয়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী অঞ্চলের তাঁতিরা বস্ত্র সরবরাহ করার ব্যাপারে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়নি। ১৭৯৯ সালে হুগলি জেলার হরিপাল অঞ্চলের তাঁতিরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে তাদের সরবরাহ করা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করলে তারা কোম্পানিকে সুতিবস্ত্র বিক্রি করবে না। কোম্পানি যখন তাঁতিদের ওপর সরকারি চাপ ও অত্যাচার প্রয়োগ করে বাজার থেকে অন্যান্য প্রতিযোগীদের বিতাড়িত করে। কোম্পানির অমানবিক নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে তাঁতিরা প্রতিবাদ করে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে তাঁতিরা কখনও দলবদ্ধভাবে দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেত, আবার কখনও কোম্পানির কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্য দেশীয় বণিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল সন্দেহ নেই, তবে এই একচেটিয়া বাণিজ্য সবচেয়ে বিধ্বংসী ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে এসেছিল সম্পদের প্রকৃত উৎপাদক অর্থাৎ মোলুঙ্গি, রায়ত ও তাঁতিদের জীবনে।

২.৩ বাণিজ্যের পরিবর্তনশীল ধারা ও অবশিল্পায়ন

১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছিল। কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের অবসানের ফলে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮১৪ সালে ভারতে রপ্তানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের মূল্য ছিল ১৮ লক্ষ পাউন্ড। ১৮২১ সালে ভারতে রপ্তানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫৫ লক্ষ পাউন্ড। ১৮১৩-১৮২৯ সালের মধ্যে কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য হারে সংকুচিত হয়। এই সময়কালের মধ্যে কোম্পানি প্রতি বছরে গড়ে ১৮,৮২,৭১৮ পাউন্ডের বাণিজ্য করেছিল। সেখানে একই সময় ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকেরা প্রতি বছর গড়ে ৫৯,৫১,৩৫২ পাউন্ডের ব্যবসা করেছিল। অধ্যাপক কে. এন. চৌধুরী ১৮১৩ সালের সনদ (চার্টার)-কে একটি দিক্‌নির্দেশিকা হিসাবে চিহ্নিত করে বলেছেন—তখন থেকেই ভারতের বহির্বাণিজ্য একটি যথার্থ 'আধুনিক চরিত্র' (modern character) নিতে শুরু করেছিল। আধুনিক বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন—তদানীন্তন ব্রিটিশ অর্থনীতির অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতের ইংরেজ সরকার ভারতীয় শিল্পে বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করেছিল। কারণ ব্রিটেনই ছিল ভারত থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাজার। কিন্তু অধ্যাপক চৌধুরীর এই ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার ও বিশ্লেষণ করা দরকার।

বাংলার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৮১৩ সালের পর আমদানি-রপ্তানি উভয় বাণিজ্যেরই যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয়েছিল। ১৮১৩-১৪ সাল থেকে ১৮১৭-১৮ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি ৪০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেখানে একই সময়ে ব্রিটেন থেকে

[illegible] The Economic History of India [illegible]

[illegible] William Bolts [illegible] Considerations on Indian Affairs [illegible] Unconceivable oppression and hardships have been practised towards the poor manufacturers and workmen of the Country, who are, in fact, monopolised

by the Company as so many slaves [illegible]

[illegible] (the market of weavers has been [illegible]) [illegible]

[illegible] (de-industrialisation) [illegible]

[illegible] The Economic Transition in the Bengal Presidency, 1793-1833 [illegible] Economic Conditions in Madras Presidency [illegible]

[illegible]

পলাশির পর থেকেই বাংলার মানুষের ওপর ইংরেজ কোম্পানির উৎপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোম্পানির এজেন্ট, দেশীয় গোমস্তারা এবং নিম্নতন কর্মচারীরা বাংলার তাঁতিদের উৎপাদকদের ওপর কী ধরনের অকথ্য নির্যাতন চালাত তা আমরা আগের অংশে আলোচনা করেছি। কিন্তু এই উৎপীড়ন তাঁতিদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করলেও অবশিল্পায়নের জন্য এই উৎপীড়ন দায়ী ছিল না। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ভালোভাবে সংঘটিত হবার আগে পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি ভারতের কুটির শিল্পজাত পণ্য ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করে মুনাফা লুটত। এই অবস্থায় ইংরেজদের ভারতীয় হস্তশিল্প ধ্বংস করার কোনো কারণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৩ সালের সনদের মাধ্যমে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লুপ্ত হবার পর এবং তথাকথিত অবাধ বাণিজ্যনীতি গৃহীত হবার পরই ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটতে আরম্ভ করেছিল। এই সময় থেকে দুটি ঘটনা ঘটতে দেখা যায়— প্রথমত, ভারতের কুটির শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি হ্রাস করে কেবলমাত্র কাঁচামাল ইংল্যান্ডে পাঠানো আরম্ভ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের মিলের কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একদিকে এদেশ থেকে কাঁচামাল পাঠিয়ে দেওয়া হল, অন্যদিকে ইংল্যান্ডের মিলে তৈরি সস্তা কাপড়ে এদেশের বাজার ভরিয়ে ফেলা হল। বিলিতি কাপড়ের অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করার জন্য অবাধ বাণিজ্যের অজুহাতে আমদানিকৃত মিলের কাপড়ের ওপর শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হল। ১৮১৫ সালে একটি আইনে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত বস্ত্রের ওপর মাত্র $2\frac{1}{2}$ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়। ইংল্যান্ডের শিল্পপতিদের শ্রেণীস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই আইন করা হয়েছিল বলা বাহুল্য। ভারতীয় শিল্পপণ্যের চাহিদা ইংল্যান্ডের বাজারে হ্রাস করার জন্য ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের ওপর ইংল্যান্ডে চড়াহারে আমদানি শুল্ক বসানো হয়েছিল। ১৮১৩ সালে বাংলার মসলিনের ওপর ৩৩ শতাংশ এবং ক্যালিকো ও 'ডিমিটি' কাপড়ের ওপর ৮৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ইংল্যান্ডের সরকার ধার্য করে। ম্যাঞ্চেস্টারের মিলে তৈরি কাপড় যখন ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলে তখন ভারতের অভিজাত ক্রেতারা নতুনত্বের নেশায় ও সস্তায় বিলিতি কাপড় কিনতে লাগল। ফলে ভারতীয় শিল্পপণ্যের চাহিদা হ্রাস পায় এবং তাঁতশিল্পে এক অভূতপূর্ব বিপর্যয় দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় তাঁতি ও কারিগরেরা তিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রথমত, ইংল্যান্ডের কারখানাগুলির কাঁচামালের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে এখান থেকে কাঁচামাল রপ্তানি করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে ভারতের তাঁতি ও কারিগরেরা কাঁচামালের অভাব অনুভব করেছিল। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের তৈরি সস্তা মিলের কাপড় ভারতে এত বেশি পরিমাণে আসতে থাকে যে দেশীয় তাঁতিদের তৈরি কাপড়ের চাহিদা কমে গেল। ইংল্যান্ডের মিলের কাপড়ের সস্তা দামের জন্য সাধারণ ভোক্তারাও এই কাপড়ের দিকে ঝুঁকেছিল। একজন সমসাময়িক পর্যটক রেগিনাল্ড হেবার (Regenald Heber) ১৮২৬ সালে লিখেছিলেন—ইংল্যান্ডের কাপড়ের সস্তা দামের জন্য খোদ ঢাকার লোকেরাও বেশি পরিমাণে এই কাপড় কিনছে। তৃতীয়ত, ভারতের শিল্পজাত পণ্য ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা কমিয়ে ফেলা এবং ভারতীয় শিল্পপণ্যের ওপর ইংল্যান্ডে চড়াহারে আমদানি শুল্ক ধার্য করার ফলে ভারতের শিল্পজাত পণ্য তার বিদেশি বাজার

হারায়। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশের বাজার দখল, বিদেশের অন্যান্য [illegible] বাজারের [illegible] হারিয়েছিল। ইংল্যান্ডের কাপড় আমেরিকা ও আফ্রিকার বাজার [illegible] আমদানি ভারতের শিল্পপণ্যের রপ্তানি কমানো হয়। [illegible] সালে [illegible] বেল ভারতীয় বস্ত্রের থান রপ্তানি করা হয়েছিল, [illegible] সালে সেই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় [illegible] বেল। [illegible] সালে ডেনমার্কে [illegible] বেল ভারতীয় বস্ত্রের থান পাঠানো হয়েছিল, [illegible] সালে এই পরিমাণ হয়েছিল [illegible] বেলের কাছাকাছি। [illegible] সালে [illegible] বেল থান গিয়েছিল, [illegible] সালে এই পরিমাণ হ্রাস পেয়ে হয়েছিল [illegible] বেল। আরব ও পারস্যের খাড়ি (Gulf) অঞ্চলের ভারতীয় পণ্য রপ্তানি এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছিল। [illegible] সাল নাগাদ বাংলা থেকে রপ্তানিকৃত বস্ত্রের মূল্য ছিল মাত্র ৫ লক্ষ টাকার সামান্য বেশি।

কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির এই পরিবর্তন স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্য আসেনি। ইংরেজ শাসক তার রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতকে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্যের একচেটিয়া ও বৃহত্তম বাজারে পরিণত করতে চেয়েছিল। তাই [illegible] থেকে শুরু করে রজনী পাম দত্ত, [illegible] প্রমুখ ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদেরা সকলেই বলেছেন উপনিবেশ শাসকের ভারতে কুটিরশিল্পের অবলুপ্তি বা অবশিল্পায়নের প্রধান কারণ ছিল ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রভাব। রজনীপাম দত্ত বলেছেন—ইউরোপের পাওয়ার লুমের আবিষ্কার ভারতীয় শিল্পের বিনাশকে সম্পূর্ণ করেছিল (The invention of power loom in Europe completed the decline of the Indian industries.)। উপনিবেশ শাসকের ভারতে যদি ঔপনিবেশিক শাসন না থাকত এবং তার পরিবর্তে যদি একটি জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় আসীন থাকত, তা হলে সেই সরকার অবশ্যই একটি সংরক্ষণ নীতি (protective policy) গ্রহণ করে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হত।

১৮১৩ সালে অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু হবার পর ভারতীয় শিল্পপণ্যের রপ্তানি কমিয়ে এবং ব্রিটিশ শিল্পপণ্যের আমদানি বাড়িয়ে ভারতীয় শিল্পকে ইংরেজরা ধ্বংস করেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত সুতিবস্ত্র শিল্পের অবলুপ্তিকে ভারতীয় ইতিহাসের সবথেকে দুঃখজনক অধ্যায় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অবশিল্পায়ন ভারতের অর্থনীতিতে তথা জনজীবনে কী মারাত্মক কুফল বয়ে এনেছিল তা আলোচনা করলেই এই বক্তব্যের সারবত্তা বোঝা যাবে। বস্ত্রশিল্পের সংকটই ছিল সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অসংখ্য তাঁতি, সুতো কাটুনি, রঞ্জক (যারা কাপড় রং করত), ধোলাইকর (যারা কাপড় সাদা করত), ধুনুরি (যারা তুলো পেঁজাই করত), [illegible] শিল্পী এবং সুতি ও রেশম শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। কোম্পানির উদ্যোগে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রগুলির অবনতি ঘটতে থাকল। কাজের অভাবে কোম্পানি নিজেই সুতিবস্ত্র ও রেশমবস্ত্রের উৎপাদনকেন্দ্রগুলি তুলে দিতে থাকে। ১৮১৮ সালে ঢাকার কুঠি বন্ধ করে দেওয়া হয়। [illegible] সালে শান্তিপুর ও মালদার কুঠি উঠে যায়। ক্রমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কুঠি ও শিল্পকেন্দ্রগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮২৫ সালের মধ্যে শিল্পকেন্দ্রগুলির এই অবনতি সম্পূর্ণ হয়। এই সব

উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে কর্মরত কারিগর ও তাঁতিরা পেশাচ্যুত হয়ে পড়ে। একটি হিসাব থেকে জানা যায় কেবলমাত্র বাংলাতেই ১০ লক্ষ লোক তাদের জীবিকা হারিয়েছিল। বিভিন্ন সমসাময়িক সরকারি দলিলপত্রে পশ্চিম ভারতের সুরাট, আমেদাবাদ, ব্রোচ, পুনা, শোলাপুর, নভসারি, প্রভৃতি স্থানের এবং দক্ষিণ ভারতের কোয়েম্বাটুর, বেলারি, তিনেভেল্লি, উত্তর আর্কট ও মাদুরার তাঁত শিল্পীদের চরম দুর্দশার কথা উল্লিখিত রয়েছে।

কর্মচ্যুত এইসব তন্তুবায় শিল্পী ও কারিগরদের সামনে সবথেকে বড়ো সমস্যা এল বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব। অধিকাংশই তাদের ঐতিহ্যগত পেশা হারিয়ে কৃষিকাজে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু এর ফলে কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণভাবে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলার অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বাড়তে থাকে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ভারতীয় জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ এবং গণেশ বাসুদেব যোশীর মতে ৮৬ শতাংশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অনেক তাঁতশিল্পী আবার খেতমজুর বা কুলির কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বহু তাঁতি কর্মসংস্থানের খোঁজে সিংহল, বর্মা ও মরিশাসে দেশত্যাগ করে চলে যায়। এছাড়াও বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের একটা বড়ো অংশ কোনো কাজই না পেয়ে অনাহারে মারা যায়। সস্তা বিলিতি সুতো আমদানি বৃদ্ধির ফলে কাটুনিদের একটা বড়ো অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হুগলি জেলার রেসিডেন্টের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—কোনো অঞ্চলে তাঁতিদের লাঙল ধরা সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তারা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে কাপড় তৈরি করে গিয়েছিল কারণ তখনও পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় হাটগুলিতে মোটা ধুতি, চাঁদর ও গামছার কিছুটা চাহিদা ছিল। কিন্তু ক্রমে এই চাহিদাও যখন কমে যায় গ্রামাঞ্চলে বিলিতি কাপড়ের অনুপ্রবেশের ফলে, তখন এই তাঁতিরা তাদের বংশানুক্রমিক পেশা হারিয়ে কাজের খোঁজে দেশান্তরী হয়। এদের মধ্যে কজন বেঁচে ছিল আর কজনই বা অনাহারে মৃত্যুর শিকার হয়েছিল তার হিসাব সম্ভবত কোনো মহাফেজখানাতেই সংরক্ষিত নেই। চিরাচরিত, ঐতিহ্যগত পেশা নষ্ট হয়ে গেল অথচ নতুন কর্মসংস্থানকারী আধুনিক কলকারখানা গড়ে উঠল না—এটাই ছিল হস্তশিল্পীদের ওপর অবশিল্পায়নের চরম দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়া।

সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবশিল্পায়ন নিয়ে এক কৌতূহল-উদ্দীপক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিতর্কের সূত্রপাত মোটামুটি ষাটের দশকে। বিতর্কের মূল বিষয়—ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে উনিশ শতকের ভারতে অবশিল্পায়ন আদৌ হয়েছিল কিনা? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আরও নানা প্রশ্ন উঠে এসেছে। মার্কিন গবেষক মরিস ডি. মরিস (Morris D. Morris) মনে করেন 'অবশিল্পায়ন' বিষয়টি একটি 'কল্পকাহিনী' (Myth) মাত্র। ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা অহেতুক বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসে কখনোই এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতেও অবশিল্পায়ন ঘটেনি। মরিসের বক্তব্য : জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা শিল্পদ্রব্যের আমদানিবৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন ভেবেছেন। যদি জনসংখ্যা এবং জাতীয় আয় বাড়ে তবে দেশীয় শিল্প অক্ষত রইল এবং আমদানি বাড়ল এমনও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্পদ্রব্যের আমদানির ফলে কোনো কোনো

ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্য ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। উনবিংশ শতকে সুতো আমদানি করার ফলে ভারতের সুতো কাটুনিরা মার খেল কিন্তু তাঁতিরা সস্তা সুতোয় সস্তা কাপড় তৈরি করতে পেরেছিল এবং সস্তা বিলিতি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পেরেছিল। তৃতীয়ত, কুটির শিল্পজাত পণ্যের নিজস্ব বাজার ছিল। দামি শাড়ি, যা মিলে তৈরি হত না বা পাটের শাড়ি, যা ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হত প্রভৃতির বাজার অক্ষুণ্ণ ছিল কারণ এক্ষেত্রে বিদেশি প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই মরিস এইসব যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন—উনিশ শতকের ভারতে অবশিল্পায়ন হয়নি বরং আর্থিক উন্নয়নই ছিল এই সময়ের ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একাধিক ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ মরিসের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। জাপানি ঐতিহাসিক তরু মাৎসুই ১৯৬৮ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধে যথেষ্ট তথ্য সহকারে মরিসের যুক্তি খণ্ডন করে স্পষ্টই বলেছেন—উনবিংশ শতকে তাঁতিদের সংখ্যা কমে যায় এবং তাদের অবস্থারও উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছিল। তাছাড়া তরু মাৎসুই এবং বিপান চন্দ্র সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে পরিমাণ সুতো আমদানি করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তৈরি কাপড় এদেশে এসেছিল। তাছাড়া বিলিতি কাপড় এদেশের বাজার দখল করার বেশ পরে সুতো আমদানি শুরু হয়। ততদিনে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের অভিঘাত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস সম্পূর্ণ করেছিল। সুতরাং সস্তায় সুতো আমদানি করার ফলে ভারতীয় তাঁতিরা তাদের তৈরি বস্ত্রের পসরা নিয়ে ব্রিটেনের মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ পেয়েছিল, মরিসের এই বক্তব্য একেবারেই ঠিক নয়। অর্থনীতিবিদ অমিয় বাগচী পরিসংখ্যানগত তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন ১৮০৯-১৩ সাল থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে গাঙ্গেয় বিহারে কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল কারিগরদের সংখ্যা কী মারাত্মক হারে হ্রাস পেয়েছিল। ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য মরিসের যুক্তির 'গোড়ায় গলদ' দেখিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—"প্রমাণ কোথায় যে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়বৃদ্ধির ফলে উনিশ শতকে বাজারের আয়তন বাড়ায়, আমদানি ও দিশি শিল্পদ্রব্য দুটোরই জায়গা ছিল, দিশি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি?" উপরে পরিবেশিত বিভিন্ন তথ্যের এবং ঐতিহাসিকদের আলোচনার ভিত্তিতে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে উনিশ শতকের ভারত-ইতিহাসে অবশিল্পায়ন ছিল একটি বাস্তব সত্য এবং ঔপনিবেশিক শাসন এই অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির পশ্চাদ্‌বর্তিতার সূচনা করেছিল। রাজনৈতিক ইতিহাসবেত্তারা দেখিয়েছেন—অবশিল্পায়নের ফলে পেশাচ্যুত কর্মহীন কারিগরেরা পরবর্তীকালে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং মরিস ডি. মরিস যাই বলুন না কেন রমেশচন্দ্র দত্ত বা রানাডের মতো উনিশ শতকীয় পণ্ডিতেরা অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আদৌ ভুল করেননি। ১৮৩৫ সালে ভারতে কোম্পানির সরকারের দুজন শুল্ক বিভাগের অধিকর্তা ডোয়েল এবং পার্কিনস্ মন্তব্য করেছিলেন—"ভারতের সঙ্গে একটি সভ্য শিল্পোন্নত দেশের সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে, অন্যান্য অর্ধবর্বর দেশের মতো ভারতেরও শিল্পের সেই অনুপাতে অবনতি ঘটবে এবং ভারতীয় জনগণ ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্য পাবার বিনিময়ে কাঁচামাল উৎপাদনের উন্নতি ঘটাতে অধিকতর আগ্রহী হবে" (As in

Scanned with CamScanner

all semibarbarous countries, the manufacturing industry of India will decline in proportion as its intercourse with a civilised manufacturing country increases and the attention of people will rather be turned to the improvement of raw produce exchangeable for the manufactured goods of England.)। এই বক্তব্য উনিশ শতকের ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে।

আর্থিক নিষ্ক্রমণ (Economic Drain)

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ছিল ইউরোপে বাংলার সম্পদের বহির্গমন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষত পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরোক্ষভাবে হলেও বাংলার রাজনীতিতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার সুবাদে ইংরেজরা বাংলার সম্পদ প্রচুর পরিমাণে নিজেদের দেশে চালান করেছিল। বাংলাদেশ থেকে নিয়মিতভাবে এই সম্পদ বেরিয়ে যাবার ঘটনাকেই ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা 'আর্থিক নিষ্ক্রমণ' (Economic Drain) নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থনীতিবিদ্ অম্লান দত্ত Economic Drain কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'অপহার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সার্বিকভাবে আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা Economic Drain বলতে আমরা বুঝি—একটি উপনিবেশের সম্পদ যখন ঔপনিবেশিক শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের দেশে নিয়ে যায়, তার প্রতিদানে উপনিবেশকে কিছুই দেয় না এবং উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত পুঁজি উপনিবেশের অনুৎপাদক এলাকাগুলিতে বিনিয়োগ করে, যা কখনোই সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হয় না। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে হ্যারি ভেরেলেস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জন শোর বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে সম্পদের নিষ্ক্রমণ নিয়ে তাদের মূল্যবান মতামত রেখেছিলেন। জন শোর ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত *Notes on Indian Affairs*-এ লিখেছিলেন—ভারতবর্ষ এক সময় যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ উপভোগ করত, তার একটা বিরাট অংশ চালান করা হয়েছে; এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সমৃদ্ধির জন্য তার শক্তিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে (India has been drained of a large proportion of wealth she once possessed ; and her energies have been sacrificed for the benefit of the few.)।

প্রকৃতপক্ষে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি তথা বেসরকারি ইংরেজ বণিকেরা বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ আহরণের নেশায় মেতে ওঠে। রাজা বদলের পালায় অংশগ্রহণ করা থেকে শুরু করে নজরানা ও পারিতোষিক বাবদ অকল্পনীয় পরিমাণ সম্পদ ইংরেজরা হস্তগত করেছিল। তার ওপর কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে মুনাফালাভের ব্যাপার তো ছিলই। পলাশি পরবর্তী যুগকে তাই ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পিয়ার "খোলাখুলি ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ" (Age of open and unshamed plunder) বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় ইংরেজরা

Scanned with CamScanner

এবং প্রশাসনিক কর্তা — বুকাননের পাশ্চাত্যবাদীরাই ইংরেজি শিক্ষানীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্কিডেকন প্রবন্ধকে আঘাত করার অগ্রণী ছিলেন। ভারতের অভ্যন্তরে গ্রন্থ এবং সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্তা সি. ই. ট্রেভেলিয়ান লিখেছিলেন — প্রতিটি নতুন প্রতিষ্ঠানই একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছে; তা হল বিদেশ থেকে খুব বেশি সংখ্যক ভারতের ছেলেদেরই সেখানে ভর্তি করা হবে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন — একটি বিশাল কামানের পাথর এবং ইটি হচ্ছে মূর্তিপূজা এবং কুসংস্কার। পরে আর্কিডেকন প্রথা এই কামানের বিস্ফোরণের পলিতায় আগুন দিয়ে শুরু করে হবে গেছে। আমাদের সকলের এই কামানের ছেড়ে দেওয়ার প্রমাণ দিতে হবে। তার ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে বুকাননের পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির প্রসার। তাঁর উদ্যোগে অনেকগুলি মিশনারি স্কুল নির্মিত হয়েছিল। সেগুলিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হত। এই স্কুলগুলির মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮৩০ সালে নির্মিত জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন।

এই একই নীতি অনুসরণ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি মিশনারি স্কুল গড়ে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত বম্বের উইলসন কলেজ, ১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজের খ্রিস্টান কলেজ, ১৮৪১ সালে নির্মিত মাসুলিপট্টমের নোবল কলেজ, ১৮৪৪ সালে নির্মিত নাগপুরের হিসলপ কলেজ এবং ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আগ্রার সেন্ট জনস্ কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে একই সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান এবং খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত।

৮.২ ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে প্রাচ্যবাদী-পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক

খুব সম্ভবত প্রাচ্যবাদী ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আঘাত এনেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তিনি ইংরেজ আইনকে ভারতে কার্যকরী করেছিলেন। উচ্চবর্ণীয় ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ থেকে তিনি অপসারিত করেছিলেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল—প্রতিটি ভারতীয়ই দুর্নীতিপরায়ণ (Every native of Hindustan, I verily believe, is corrupt.)। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ১৭৯১ সালে 'নেটিভ এক্সক্লুসন অ্যাক্ট' (Native Exclusion Act)-এর মাধ্যমে ভারতীয়দের উচ্চপদ থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। কর্নওয়ালিসের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন জেমস্ মিল, তাঁর ১৮১৮ সালে প্রকাশিত *History of British India* গ্রন্থে। মিল ভারতীয়দের অনান্তরিক, বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। মিল বা কর্নওয়ালিসের কিন্তু পাশ্চাত্যবাদী আদর্শে প্রশ্নাতীত আস্থা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নির্মম বিষোদ্গার করেছিলেন। অথচ ভারতীয় সংস্কৃতি বা সভ্যতা সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা ধারণা ছিল না। তবে ভারতীয়দের প্রতি তাঁদের ঘৃণা ওয়ারেন হেস্টিংস, কোলব্রুক বা উইলসন প্রচারিত প্রাচ্যবাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালীন পাশ্চাত্যবাদী (anglicist)-দের অনেকটাই সাহায্য করেছিল। প্রাচ্যবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী, সংস্কৃতের বিখ্যাত পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন ১৮২১ সালে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮২৪ সালের ১ জানুয়ারি এই প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য

ছিল হিন্দু সাহিত্যের চর্চা এবং তার সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রসার। ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে কোম্পানি সরকার 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' গঠনের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারকে অগ্রাধিকার দেয়। এই কমিটির অন্যতম সদস্য হল্ট ম্যাকেঞ্জি তাঁর প্রতিবেদনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন। তাছাড়া তিনি আরও দুটি সংস্কৃত কলেজ এবং একটি মাদ্রাসা তৈরি করার প্রস্তাব করেছিলেন।

১৮১৭ সালে বাংলার একদল ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণীর উদ্যোগে হিন্দু কলেজ গড়ে ওঠে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এবং ডেভিড হেয়ার এই কলেজ তৈরি করেছিলেন, তা সত্ত্বেও এই কলেজ পরিচালনার এবং আর্থিক ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, প্রসন্ন ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তি। ১৮২৩ সাল নাগাদ এই কলেজ এক মারাত্মক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। তখন ডেভিড হেয়ারের অনুরোধে এইচ. এইচ. উইলসন আর্থিক সংকটের হাত থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করেন। উইলসন হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে দেখেছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য সংস্কৃত কলেজের বাড়িতে হিন্দু কলেজ বসেছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার। হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর বাঙালি সদস্যরা সকলেই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং তাঁদের স্বার্থ নানাভাবে ইংরেজদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। তাঁরা সমসাময়িক পাশ্চাত্য জ্ঞানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং ইংরেজ প্রাচ্যবাদীরাও অনেকটা একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গ্রহণ করেছিলেন। পারম্পরিক জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদাবোধ থেকেই পাশ্চাত্য জ্ঞান এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বিত একটি পাঠক্রম হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে তৈরি হয়েছিল। এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয়—এশিয়াটিক সোসাইটিতে কেবল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা হত। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান দুটিতে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞানও বিতরণ করা হত।

১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা একটি চিঠিতে রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন—সংস্কৃত শিক্ষা করে ছাত্ররা কেবল ব্যাকরণ ও অধিবিদ্যাগত জ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করবে, বাস্তব জীবনে যার প্রয়োজন অত্যল্প। প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যবাদী এবং পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে লক্ষ্যের বিশেষ তারতম্য ছিল না, পার্থক্য ছিল পন্থায়। উভয় গোষ্ঠীই চেয়েছিল যে পাশ্চাত্যে যেরকম বাস্তবানুগ জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে এদেশেও সেরকম ঘটুক। কলকাতার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ ইতিমধ্যে ইংরেজি ভাষা শিখতে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। অতি সাবধানী প্রাচ্যবাদীরা এই সহজ সত্যটুকু বুঝতে না পেরেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে চলেছিলেন।

সময় ছিল পাশ্চাত্যবাদীদের অনুকূলে। ১৮২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর এলফিনস্টোন তাঁর মিনিটে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। বম্বের গভর্নর স্যার জন ম্যালকম ১৮২৮ সালে লিখেছিলেন—একদল ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়কে আমাদের শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত করা দরকার। কোম্পানি সরকারের আর্থিক

Scanned with CamScanner

সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার জন্য ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা একান্ত জরুরি। ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্যের অবসানের পর এবং অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু হবার পর ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলবস্ত্রের চাহিদা ভারতের শিক্ষিত মুৎসুদ্দি শ্রেণীর মধ্যে তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে কোম্পানির সরকারের সামনে নতুন প্রয়োজন এসে দেখা দিল। এই নতুন প্রয়োজনের বিষয়টি ১৮৩০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর লেখা কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্-এর একটি চিঠিতে স্পষ্টভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই চিঠিতে বলা হয়েছিল—বৌদ্ধিক এবং নৈতিক দিক দিয়ে একটি শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলে তাদের উচ্চ প্রশাসনিক পদে বহাল করতে হবে (.....to raise a class of persons, qualified, by their intelligence and morality, for high employments in the civil administration of India.)। ১৮৩৪ সালে চার্লস ট্রেভেলিয়ান লিখেছিলেন—এশীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা উচিত। সমসাময়িক গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তাঁর হিতবাদী দর্শনের প্রভাব থেকেই বিশ্বাস করতেন—মানুষের অজ্ঞতাই তার হতাশা এবং অধঃপতনের জন্য দায়ী। মানুষের কল্যাণের একমাত্র সহায়ক ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদান। ১৮৩৪ সালের ১ জুন তিনি লিখেছিলেন—ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করার একমাত্র ওষুধ সাধারণ শিক্ষা। ১৮২৮ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হবার আগেই বেন্টিঙ্ক ভারতে শিক্ষাবিস্তার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার বিষয়ে তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

প্রাচ্যবাদী ধ্যানধারণার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল মেকলের হাতে। ১৮৩৪ সালে মেকলে ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে আইন সদস্য নিযুক্ত হন। তাছাড়া জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের সভাপতি পদেও তাঁকে বহাল করা হয়। মেকলে ইংরেজদের জাতিগত উৎকর্ষে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল ইংরেজরাই সমগ্র বিশ্বের জাগতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিশারি। তাঁর এই মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করেছিল। জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের সভাপতি হিসাবে মেকলে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তাঁর বিখ্যাত মিনিট পেশ করেন। এই মিনিটে তিনি বলেন—প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে একদল ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি করা, "যারা আমাদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ শাসিত মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবে। তারা হবে সেই শ্রেণীর মানুষ যারা বর্ণে ও রক্তে থাকবে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, মতাদর্শে, নৈতিকতায় এবং বৌদ্ধিক প্রয়াসে হবে ইংরেজ" (..... who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons Indian in colour and blood, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.)। মেকলে তাঁর মিনিটে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন—যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদান করবে, তারা আর কোনো সরকারি অনুদান পাবে না। তিনি সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়া এবং হিন্দুদের উন্নতিসাধনের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন।

মেকলে মিনিট কতকগুলি প্রাথমিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে রচিত হয়েছিল, প্রথমত, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির ১৮৩২-১৮৩৫ সাল পর্যন্ত বার্ষিক প্রতিবেদনগুলিতে বলা

হয়েছিল যে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বই-এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। সমস্ত দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত বই-এর তুলনায় ইংরেজি বই-এর বিক্রি বেশি। ১৮৩২ সালে জানুয়ারি মাস থেকে ১৮৩৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১৪,৭৯২টি ইংরেজি বই বিক্রি হয়েছিল। সেখানে যাবতীয় দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত একত্রে বই বিক্রির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫,৮৮৭টি। ১৮৩৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৮৩৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইংরেজি বই বিক্রির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩১,৬৪৯। সেখানে একই সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত মাত্র ৭,২৬০টি বই বিক্রি হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ১৮৩৪ সালের মার্চ মাসে সংস্কৃত কলেজের কিছু প্রাক্তন ছাত্র জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সম্পাদককে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে শিক্ষা সমাপ্ত করেও তাঁরা কোথাও চাকরি পাচ্ছেন না। একই চিঠিতে তাঁরা সরকারের কাছে তাঁদের 'সচ্ছল জীবনযাপন' করতে সাহায্য করার জন্য আবেদন রেখেছিলেন। ১৮৩৪ সালের ১৯ মার্চ বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি অভিযোগ করেছিলেন—কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে প্রথাগত হিন্দুশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করে ব্রাহ্মণদের তাদের 'দুর্ত ব্যবসায়' (wicked trade) শিখতে সাহায্য করেছে। স্বাভাবিকভাবেই লেখক দুর্ত ব্যবসা বলতে যজমানবৃত্তির কথা বুঝিয়েছিলেন। উপরোক্ত তথ্যসমূহের ওপর ভিত্তি করেই মেকলে মিনিট রচিত হয়েছিল।

মেকলে মিনিট লর্ড বেন্টিঙ্ককে উৎফুল্ল করেছিল। কলকাতা শহরের বণিকগোষ্ঠীও মেকলের সুপারিশগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এসেছিল চার্লস ট্রেভেলিয়ানের কাছ থেকে। তিনি বলেছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষেরা নানাভাবে সরকারকে সাহায্য করবে এবং সরকারের কাছ থেকে নানারকম সাহায্য নেবে। ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন একই সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষা করবে।

মেকলে মিনিটের ভিত্তিতে ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ বেন্টিঙ্ক তাঁর প্রস্তাব ঘোষণা করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়—সরকারের উদ্দেশ্য ভারতীয়দের ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের জন্যই ব্যয়িত হবে। তবে সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়া হল না। বেন্টিঙ্কের দৃঢ় ধারণা ছিল যে—ইংরেজদের বিজিত ভারতীয় সাম্রাজ্য নানা ধরনের পাপ, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও নিষ্ঠুর রীতিনীতিতে পরিপূর্ণ। সরকারের উদ্দেশ্য হবে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের নৈতিক জাগরণ ঘটানো। বেন্টিঙ্কের এই ধারণার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তদানীন্তন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর একাংশ মেকলে-বেন্টিঙ্ক প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ইংরেজ প্রাচ্যবাদীরাও বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। এইচ. টি. প্রিন্সেপ দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চার জন্য সরকারি সাহায্য বাড়ানোর দাবি তুলে আসছিলেন। ১৮৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে এইচ. এইচ. উইলসন বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন এই নীতিতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। মেকলে ও বেন্টিঙ্কের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ অনুধাবন করে

Scanned with CamScanner

ব্রায়ান হজসন (Brian Hodgson) নামে জনৈক প্রাচ্যবাদী পণ্ডিত ১৮৩৫ সালে *The Friend of India* পত্রিকায় কতকগুলি চিঠি লেখেন। তিনি অত্যন্ত সঠিকভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—"মেকলেতন্ত্র আমাদের সঙ্গে জনসাধারণের আরও দুঃখজনক বিচ্ছেদ ঘটাতে সাহায্য করবে" (Macaulayism ..... will help to widen the existing lamentable gulf that divides us from the mass of people.)।

১৮৩৯ সালের ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের মিনিটের মাধ্যমে প্রাচ্যবাদ-পাশ্চাত্যবাদ বিতর্কের অবসান ঘটানো হল। এই মিনিটে একটি সমঝোতা করা হল। এই মিনিটে বলা হল—ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর প্রয়াস অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রাচ্যবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বছরে ৩১,০০০ টাকা অধিক বরাদ্দ করা হবে। দেশীয় ভাষা এবং ইংরেজি ভাষা—দুই-এর মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হবে। ছাত্ররা নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী মাধ্যম বেছে নেবে।

৮.৩ ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার

১৮৩৫ সালের পর ইরেজি ভাষায় ওপর নির্ভরশীল পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে জনশিক্ষা সংক্রান্তির সেমিনারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৪০। ছাত্রসংখ্যা তিনশো বা চারশো থেকে বেড়ে হয়েছিল চার হাজার। ১৮৩৮ সালের ট্রেভেলিয়ান ইংরেজি শিক্ষার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, উৎফুল্ল প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর প্রকাশিত লর্ড হার্ডিঞ্জের ডেসপ্যাচে চাকরি পাবার জন্য ইংরেজি ভাষার জ্ঞানকে অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা করা হয়। বলা হয়—ইংরেজি ভাষার মেধাবী ছাত্রদের সরকারি উচ্চপদগুলিতে নিয়োগ করা হবে।

১৮৪৩ সালে বাংলাদেশে কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন গঠিত হয়। ঐ বছর কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৮। ১৮৫৫ সালে ঐ সংখ্যা বেড়ে হয় ১৫১। একই সময়ের মধ্যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৪,৬৩২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩,১৬৩। কিন্তু ১৮৪৩ সালে শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪,১২,২৮৪ টাকা; ১৮৫৫ সালে এই পরিমাণ বেড়ে হয় মাত্র ৫,৯৪,৪২৮ টাকা। অর্থাৎ যে হারে স্কুল ও স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বেড়েছিল সে হারে শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বাড়ানো হয়নি। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ভারতীয়দের পক্ষে উপযোগী এবং কোম্পানি সরকারের স্বার্থরক্ষাকারী একটি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সংক্রান্ত 'উড্‌স ডেসপ্যাচ' প্রকাশিত হয়। এই ডেসপ্যাচ সরকারকে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দেয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ও দেশীয় দু-রকম ভাষার সাহায্য গ্রহণ করার কথা উড্‌স ডেসপ্যাচে বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত।

Scanned with CamScanner

বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম যখনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তখনই এই শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা বিদেশি শাসকদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। এই নব্য-শিক্ষিত মানুষেরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও তাঁদের কার্যাবলির মধ্যে কেউই সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। কারণ তাঁদের অস্তিত্ব কোম্পানি সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। এটাই ছিল বাংলার উনবিংশ শতকের জাগরণের মূল ধারা, যদিও মাঝেমধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ধরা পড়েছিল। এই সময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নিয়ে পর্যালোচনা করলে জাগরণের মূল ধারা এবং তার ব্যতিক্রমের দিকগুলি সহজে উপলব্ধি করা যাবে।

৮.৪.১ রামমোহন রায়

রামমোহন রায় একটি সম্মানিত ও ধর্মীয় ঐতিহ্যসম্পন্ন রাঢ়ী কুলিন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নবাবি আভিজাত্যের দিনগুলির অবসানের ফলে তাঁর পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানি সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে এই পরিবার পুনরায় সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। কর্নওয়ালিসের ভূমিরাজস্ব নীতির ফলে সম্পত্তি হিসাবে জমির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৯৩ সালের ৬ মার্চ কর্নওয়ালিস কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—দেশীয় অভিজাতদের হাতে যে প্রচুর পরিমাণ পুঁজি সঞ্চিত আছে, সেই পুঁজি জমি কেনার জন্য বিনিয়োগ করানো যাবে, যদি জমির মালিকানা সংক্রান্ত নিরাপত্তা বাড়ানো যেতে পারে। অন্যান্য শহুরে পয়সাওলা লোকেদের মতোই রামমোহন কর্নওয়ালিসের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে ১৭৯৯ সালে ৭নং রেগুলেশনের পর প্রচুর জমি ক্রয় করেছিলেন। জমিদারি থেকে আয় করা ছাড়াও তিনি সুদের বিনিময়ে কোম্পানির কর্মচারীদেরও ঋণ দিতেন। সুতরাং ইংরেজ শাসনের প্রতি রামমোহনের প্রশংসামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার পেছনে যথেষ্ট বাস্তব কারণ ছিল।

রামমোহন রায় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ইংরেজ শাসন ভারতীয়দের অজ্ঞতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেবে, তাদের সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে ভারতে কানাডার মতো একটি মিশ্র জাতির সৃষ্টি হবে। এরা কোনোদিনই ইংল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। স্যার জন ম্যালকম লিখেছিলেন—ভারতবর্ষকে সভ্য করার সবথেকে সহজ উপায় ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, কারণ ভারতবর্ষ ব্রিটেনের উপনিবেশ হলে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হবে এবং জমির দাম বাড়বে। রামমোহন রায়ও অনেকটা একই রকম চিন্তাভাবনা করতেন। তিনি বলতেন গ্রামের মানুষ ঔপনিবেশিক শাসন মেনে নিতে দ্বিধা করবেন না কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে গ্রামাঞ্চলে মেহনতি মানুষের মজুরি বৃদ্ধি পাবে। তিনি নীলকর সাহেবদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। ন্যাথানিয়েল আলেকজান্ডারকে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন—নীল আবাদকারী ইউরোপীয় সাহেবরা নীলচাষিদের অধিক টাকা অগ্রিম ও আফিম কেনার জন্য যথেষ্ট ভালো দাম দেয়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে নীলের আবাদ বাংলার চাষিদের চরম দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একাধিক কৃষক অভ্যুত্থান

Scanned with CamScanner

হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজরা বাংলাদেশে নীলচাষ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে রামমোহন রায় ও তাঁর সঙ্গীরা ইংরেজ শাসনের জয়গান গেয়েছিলেন। ভি. জ্যাকেমোঁ (V. Jacquemont)-কে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন—ভারতবর্ষের আরও দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজ আধিপত্য মেনে নেওয়া দরকার, কারণ সে ইংরেজ শাসনাধীনে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনর্ঘোষিত করছে (India requires many more years of English domination so that...she is reclaiming her political independence.)।

উনিশ শতকীয় জাগরণে রামমোহন শাসকদের সহযোগিতায় সবথেকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ধর্মের ক্ষেত্রে। ১৮২৮ সালে তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন—"আমি মনে করি ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার জন্য তাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আসা উচিত" (It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.)। ধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের এই ধারণা এসেছিল, যখন তিনি পরিণত বয়স্ক। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর ধর্মীয় আবেগের তাগিদে ফার্সি ভাষায় তুহফুৎ-ই-মুয়াহিদ্দিন রচনা করেন। এই গ্রন্থ খুব সম্ভবত ১৮০৪ সালে রচিত হয়েছিল। এখানে তিনি জোরের সঙ্গে এক সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন, যার দ্বারা গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে। ঐ লেখায় তিনি মুজ্‌তাহিদ বা ধর্মীয় দালালদের (যারা নিজেদের ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র বলে দাবি করে) যুক্তি-বিবর্জিত কার্যকলাপ এবং কুসংস্কারের তিক্ত সমালোচনা করেছিলেন। রামমোহনের মতে, এরা জনসাধারণের বৌদ্ধিক ও যুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তুহফুৎ-এ যে যুক্তি তিনি তুলে ধরেছিলেন তার স্বরূপ ছিল এইরকম—কেবলমাত্র একজন সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব রয়েছে; পারলৌকিক বিশ্বাস ও আত্মার অস্তিত্ব এবং ধর্মীয় দালালদের বা পুরোহিত শ্রেণীর নেতিবাচক তথা প্রতারণামূলক ভূমিকা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকার দেখিয়েছেন—তুহফুতে রামমোহন যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, তার থেকে পরবর্তীকালে তিনি অনেকটাই সরে এসেছিলেন। রামমোহনের অধ্যাত্মবাদের শিকড় অনেকটাই শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের মধ্যে গ্রথিত ছিল। তাঁর নির্গুণ ব্রাহ্মণ ও জীবের মধ্যে ঐক্য, মোক্ষের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং কর্মকাণ্ডের আপেক্ষিক অপ্রাসঙ্গিকতা প্রভৃতি সংক্রান্ত ধারণাগুলি শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ থেকে এসেছিল। কিন্তু অন্তত দুটি ক্ষেত্রে শংকরের অদ্বৈতবাদের সাথে তাঁর মতানৈক্য ছিল। প্রথমত, শংকরের কাছে পুজো করার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল জ্ঞানলাভ করা। প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ অজ্ঞাত ও দ্বৈধতাকে দূরে সরিয়ে রেখে মোক্ষলাভ করতে পারে। কিন্তু রামমোহন রায় জ্ঞানলাভের থেকে পূজা-পার্বণকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় উপদেশ ও ধর্মীয় গাথা থেকে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য পাঠ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, শংকরের সন্ন্যাস-সংক্রান্ত ধারণাও রামমোহন তাঁর উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন। রামমোহন রায় ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে বেদান্ত দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পাঁচটি প্রধান উপনিষদ অর্থাৎ

কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের একটি টীকা রচনা করেছিলেন। স্যানফোর্ড আর্নট লিখেছেন—"সামাজিক কল্যাণের থেকে ধর্মীয় ব্যাপারেই রামমোহনের উৎসাহ ছিল বেশি এবং তিনি নাস্তিকতার কুফল সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তৎকালীন কলকাতায় পূর্ব ভারতীয়দের নিয়ে বিশেষত কয়েকজন হিন্দু যুবককে নিয়ে একটি দল গড়ে উঠেছিল (নব্যবঙ্গের কথা বলা হয়েছে)। যাঁরা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি এই দলকে তিক্ত ভাষায় নিন্দা করতেন এবং মনে করতেন এরা ধর্মান্ধ হিন্দুদের থেকেও ক্ষতিকারক" (He became more strongly impressed with the importance of religion to the welfare of the society, and the pernicious effect of skepticism...He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta partly composed of East Indians, partly of the Hindu youth, who from education had learnt to reject their own faith...This he thought more debared than the most bigotted Hindu.)। কিশোরীচাঁদ মিত্রও রামমোহনের উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে বলেছেন তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় বেন্থামাইট এবং তিনি কোনো মতের সত্যতা বা অসত্যতার দিকের চেয়ে উপযোগের দিকটিকেই অধিক গুরুত্ব সহকারে দেখতেন। তিনি নিজে পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু পৌত্তলিকতাকে পুরোপুরি বর্জন করতে বলেননি। তিনি বলতেন, যাদের মানসিকতা যথেষ্ট পরিণত নয়, তারা মূর্তিপূজা করতে পারে। তাঁর ধর্মীয় উপযোগিতাবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন আমরা দেখি যে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেদান্ত দর্শনের কিছু মতও গ্রহণ করেননি। বেদান্ত দর্শন যাবতীয় পার্থিব বিষয় এমনকি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বর্জনের কথা বলেছে। কিন্তু রামমোহন বেদান্তের এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেননি। খ্রিস্টান নীতিবোধের প্রতি তাঁর অনুরাগ এসেছিল সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতার প্রতি আনুগত্য এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে সখ্যতা থেকে।

রামমোহন তাঁর সামাজিক ও ধর্মীয় ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে অভিজাত শ্রেণীর একাংশকে নিয়ে আত্মীয় সভা গঠন করেন। কিন্তু আত্মীয় সভার কার্যাবলি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। মানুষের মধ্যে দ্রুত ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য তিনি ১৮২৮ সালের আগস্ট মাসে ব্রাহ্মসভা গঠন করেন। ১৮৩০ সালে জানুয়ারি মাসে এই সংগঠনের নাম হয় ব্রাহ্মসমাজ। তুহফুৎ-এ এবং সংক্ষিপ্তাকারে বেদান্ত অনুবাদ করতে গিয়ে রামমেহান রায় পুরোহিততন্ত্রকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণই মূর্তিপূজার অর্থহীনতা সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থেই এসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা ও ক্রিয়াকলাপ টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি ব্রাহ্মণদের কুসংস্কার এবং ব্রাহ্মণদের নিজেদের জাগতিক সুবিধার জন্য এইসব কুপ্রথাকে তারা যে মদত দেয় এইসব ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর কাজের বড়ো রকম বিচ্যুতি চোখে পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের উদ্বোধনের দিনটিতে ব্রাহ্মণদের অর্থ উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। হেমচন্দ্র সরকারের লেখা থেকে জানা যায়—এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছিল। একটি আলাদা ঘরে কেবলমাত্র

Scanned with CamScanner

ব্রাহ্মণেরাই বসেছিলেন এবং একমাত্র তাদেরই বেদ পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার ও কুপ্রথার হাত থেকে অশিক্ষিত সাধারণকে মুক্ত করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রাহ্মসমাজ দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ কতিপয় শিক্ষিত মানুষের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মতো কিছু সদস্যের কার্যকলাপে যথেষ্ট অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল কারণ তাঁরা সমাজে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বলতেন, কিন্তু বাড়িতে মূর্তিপূজা চালিয়ে গিয়েছিলেন। রামমোহন সমাজের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারেননি। তাছাড়া কতকগুলি বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি নিজে একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন বাংলার গ্রামীণ সমাজে বলরামী, রামবল্লভী, সাহেবধনী প্রভৃতি কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী (sect) ছিল যারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে ধর্মাচরণ করত। রামমোহন কখনোই এই একেশ্বরবাদী গোষ্ঠীগুলিকে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত করার প্রয়াস নেননি।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও রামমোহন রায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় সোচ্চার হয়েছিলেন। স্ক্র্যাফটন লিখেছেন—সতীদাহ প্রথার প্রচলন কেবলমাত্র উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গের পরিবারগুলির মধ্যেই সীমিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের অন্তিমলগ্নে জে. এস. স্টাভরিনাস (J. S. Stavorinus) লিখেছিলেন—কয়েকটি বর্ণের মধ্যেই সতীদাহের প্রচলন ছিল। এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারিরা। উইলিয়াম কেরি গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে এই কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছিলেন। এই প্রথার বিরুদ্ধে সরকারি হস্তক্ষেপ ক্রমে শুরু হয়েছিল। ১৮১২, ১৮১৩ ও ১৮১৭ সালের রেগুলেশন মারফত সরকারি হস্তক্ষেপ এবং মিশনারিদের কার্যকলাপের ফলে ১৮১৮ সাল থেকে সতীদাহের ঘটনা বেশ কমতে শুরু করেছিল। একথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রামমোহন ঐ বছরই প্রথম সতীদাহ প্রথাকে আক্রমণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রামমোহনের আগেই ১৮১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সতীদাহ প্রথাকে আক্রমণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই সময় সরকারি হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন বছরে সতীদাহের ঘটনার সংখ্যা ছিল এরকম : ১৮১৮—৮৩৯, ১৮১৯—৬৫০, ১৮২০—৫৯৮ এবং ক্রমে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৮২৮ সালে হয় ৪৬৩। রামমোহন রায় তাঁর সম্পাদিত *সংবাদ কৌমুদি* পত্রিকায় বারবার সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য রেখেছিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৭নং রেগুলেশন জারি করে সতীদাহ প্রথাকে বেআইনি এবং ফৌজদারি আদালতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের পরই স্যার জন শোর বলেছিলেন—এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত এতটাই সরব যে, যে-কোনো গভর্নর জেনারেলই একই পদক্ষেপ নিতেন। বেন্টিঙ্ক নিজেও স্বীকার করেছিলেন যে জনমতকে অগ্রাধিকর দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বেন্টিঙ্কের নিজস্ব চিঠিতেই আছে যে ১৮২৪-১৮২৮ সালের মধ্যে যশোরের এক ম্যাজিস্ট্রেট সতীদাহ বন্ধের ব্যাপারে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনসাধারণ কোনো

প্রতিবাদ করেননি। রামমোহনের আশঙ্কা ছিল যে এই প্রথার বিরুদ্ধে আইনি হস্তক্ষেপ করলে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং তার ফল হবে মারাত্মক। কিন্তু উপরোক্ত তথ্যসমূহ প্রমাণ করে যে রামমোহনের এই আশঙ্কা ছিল ভিত্তিহীন ও অমূলক। ঐতিহাসিক সালাউদ্দিন আহমেদ দেখিয়েছেন যে রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করার সময় কিন্তু মানুষের যুক্তি ও বিবেকবোধের কাছে আবেদন না করে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বস্তুত এখান থেকেই উনিশ শতকীয় জাগরণের একটি ধারা তৈরি হয়েছিল—কোনো বিশেষ সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে প্রায় সকলেই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার উপস্থাপনা করতেন। এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রতি আনুগত্য থেকেই রামমোহন রায় তাঁর *পাঠ্য প্রদান*-এ বৈধব্যের কৃচ্ছ্রতাসাধনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর কিন্তু বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন।

বাংলার 'নবজাগরণের' পথিকৃৎ রামমোহন রায় কিন্তু তর্কশাস্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে যুক্তি (reason)-কে গ্রহণ করেননি। তিনি *কেনোপনিষদ*-এর মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে স্পষ্টই বলেছিলেন যুক্তির সাহায্যে সর্বদাই সত্যকে জানা যায় না। যুক্তি অনেক সময়েই এক সার্বিক সন্দেহের জন্ম দেয়। খ্রিস্টান মিশনারিরা যখন জাতিভেদ প্রথাকে আক্রমণ করেছিলেন তখন রামমোহন জাতপাত ব্যবস্থাকে তাত্ত্বিক এবং বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকে সমর্থন করেছিলেন। ১৮২০ সালে রচিত *ব্রহ্ম-পৌত্তলিক সংবাদ*-এ তিনি সনাতন হিন্দু দর্শনের কর্মের তত্ত্বকে ভিত্তি করে জাতপাত ব্যবস্থা এবং তার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রথার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৮২৭ সালের ২৪ জুন রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাডাম লিখেছিলেন—বর্তমান হিন্দু সমাজে প্রচলিত খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলা তিনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন (All the rules in the present state of Hindu society he finds it necessary to observe, relating to eating and drinking.)।

পরবর্তী প্রজন্মের বহু শিক্ষিত মানুষই রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে পাঠানো একটি চিঠিতে রামমোহন লিখেছিলেন—হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে শিক্ষাদানের জন্য যে সংস্কৃত স্কুল গড়ে তোলার সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার ফলে ছাত্ররা কেবল ব্যাকরণ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই জ্ঞান সম্পূর্ণ মূল্যহীন। তিনি বেদান্ত, মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রকে ছাত্রদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং পরিবর্তে অঙ্ক, দর্শন, রসায়ন, অস্থিবিদ্যা প্রভৃতি পড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁর চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যায়। তিনি নিজে কিন্তু ১৮২৬ সালে একটি বেদান্ত কলেজ তৈরি করেন। এই কলেজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার শিক্ষিত মানুষকে কুসংস্কার ও মূর্তিপূজা সংক্রান্ত অন্ধকার থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ঐশ্বরিক চিন্তার আলোয় নিয়ে আসা। স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ যখন খ্রিস্টানধর্ম-নির্ভর শিক্ষাবিস্তারের জন্য ১৮২৯ সালে কলকাতায় আসেন, তখন তিনি রামমোহনের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষাদান পদ্ধতি তথা নব্যবঙ্গদের

Scanned with CamScanner

সনাতন হিন্দুধর্ম-বিরোধী আচরণ রামমোহনকে ক্রুদ্ধ করেছিল এবং এদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে শাসকদের কাছে ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়ানোর দাবি তুলে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রেখেছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার যথাযথ প্রয়োগ তিনি করেননি এবং ঐতিহ্যগত নৈতিক শিক্ষার কাঠামোর বাইরে তিনি যেতে পারেননি। হয়তো সে যুগের বিচারে তা সম্ভবও ছিল না। সাধারণ মানুষকে মুক্তির আলোকে আলোকিত করার চেয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতেই তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের কার্যকলাপের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এই যে তিনি পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে নারীর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে মেয়েদের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বা নারীশিক্ষা বিষয়ে তিনি কোনো গঠনমূলক ও পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি রাখেননি। প্রখ্যাত পণ্ডিত সুশীল কুমার দে মন্তব্য করেছেন—রামমোহন কোনোদিনই বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা এবং বিবাহের সময় মেয়ে বিক্রি করা প্রভৃতি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি।

সুশীল কুমার দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *History of Bengali Literature in 19th Centurey*-তে স্পষ্টই বলেছেন—রামমোহনকে যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে তা একটি অতিকথা বা Myth ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর মতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে। উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং তারিণীচরণ মিত্রের হাতে যে ধারার ও ঐতিহ্যের সূত্রপাত, সেই ধারাকেই পরবর্তীকালে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিবর্তনে রামমোহন রায়ের স্থান নেই বলে অধ্যাপক দে মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক দে'র সুচিন্তিত মতামত—"রামমোহনের গদ্য কখনোই বাংলা গদ্যের বিকাশে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি বা নির্দিষ্ট স্থান করে নিতে পারেনি। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে তাঁর কোনো রচনাই বাংলা সাহিত্যে ধ্রুপদী হিসাবে স্বীকৃত হয়নি" (Rammohan's prose never influenced nor had it any definite place in this regular course of development. It is no wonder, therefore, that none of his works ever became a classic in Bengali literature.)। প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের বাংলা ভাষা ছিল অত্যন্ত কঠিন, পুঁথিগত এবং সাহিত্যশৈলী বিবর্জিত। পরবর্তী প্রজন্মের গদ্যকারেরা, এমনকি অক্ষয়কুমার দত্ত ও কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী যাঁরা কঠিন গদ্য লিখতেন, তাঁরা পর্যন্ত দার্শনিক প্রবন্ধ লেখার সময় রামমোহনের রচনাশৈলী অনুসরণ করেননি।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। *সংবাদ কৌমুদি* প্রকাশের মাধ্যমে তিনি সমসাময়িক ভারতীয়দের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিলেন। ১৮২৩ সালে কোম্পানি সরকার প্রেস অর্ডিন্যান্স (press ordinance) জারি করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। রামমোহন রায় ইংরেজ সরকারের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার এবং বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে রামমোহনের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু

'প্রেস অর্ডিন্যান্স'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে রামমোহন সরকারের প্রতি যে আবেদনপত্র লিখেছিলেন সেই আবেদনপত্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে তিনি যত না সোচ্চার হয়েছিলেন, তার থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শাসিতের বাক্‌স্বাধীনতা স্বাধীনতার সপক্ষে সরব হবার সময়ও তিনি ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করতে ভোলেননি। অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস রামমোহনকে 'বিশ্বপথিক' বলে অভিহিত করেছেন। একথা সত্যি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলায় রামমোহন ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষিত একজন মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় এবং প্রাচীন হিন্দু দর্শনে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাছাড়া পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ১৮২১ সালে ইতালির নেপল্‌সে যে রাজতন্ত্র-বিরোধী বিদ্রোহ হয়েছিল তার পরাজয় রামমোহনকে ব্যথিত করেছিল। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের সাফল্য তাঁকে পুলকিত করেছিল। তদানীন্তন ইউরোপে স্বৈরতন্ত্র বনাম উদারপন্থার সংঘাতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল উদারপন্থার দিকে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি কোনো কথা বলেননি। বরং ঐ শাসনের প্রতি তিনি ছিলেন অসম্ভব মোহগ্রস্ত। রামমোহন যখন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি *'রিফর্মার'* (Reformer) পত্রিকায় তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠির মূলকথা ছিল—ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয়দের আত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক উন্নতি ঘটেছে। সুতরাং ইংরেজ সরকারের প্রতি ভারতীয়দের আনুগত্য থাকা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়কে 'ভারত পথিক' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবর্ষে ১৯৩৩ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখেছিলেন—রামমোহন ছিলেন ভারতের 'আধুনিক যুগ'-এর পথিকৃৎ (Rammohan Roy inaugurated the Modern Age in India)। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন—রামমোহন তাঁর সময়ে বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যে ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সম্পূর্ণভাবে আধুনিক যুগের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন (Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man to realise completely the significance of the Modern Age.)। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উল্লিখিত 'আধুনিক যুগ' কথাটির দুটি দিক রয়েছে। একদিকে রয়েছে শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিনির্ভর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে রয়েছে সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সামাজিক দর্শন ও ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যেই সীমিত সামাজিক সংস্কার এবং ধর্মনির্ভর যুক্তিবাদের প্রসার। উনিশ শতকের ভারত ইতিহাসে প্রথম দিকটি উন্মোচিত হয়নি। রামমোহন রায় ছিলেন দ্বিতীয় ধারাটির একজন অগ্রগণ্য প্রতিনিধি।

৮.৪.২ ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ

জন্মগত দিক দিয়ে হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন একজন ইউরেশিয়ান, চলতি ভাষায় যাঁদের ফিরিঙ্গি বলা হত। ১৮০৯ সালে ডিরোজিও কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার

Scanned with CamScanner

ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে পড়ার সময় তিনি তাঁর স্কটিশ শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এখান থেকেই তাঁর মধ্যে এক চরমপন্থী-যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। ফরাসি বিপ্লবের মানবিক আদর্শ এবং ভলটেয়ার, হিউম, বেকন, লক, টম পেইন প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকের যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতি ডিরোজিওর প্রচণ্ড অনুরাগ ছিল। ১৮২৬ সালে (মতান্তরে ১৮২৭ সালে) তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে হিন্দু কলেজের সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ডিরোজিওর জনৈক জীবনীকার তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন—"তাঁর আগে বা পরে, একটি ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর কোনো শিক্ষকই তাঁর মতো ছাত্রদের ওপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি" (Neither before, nor since his day, has any teacher, within the walls of a native educational establishment in India, ever exercised such an influence over his pupils.)। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থে লিখেছিলেন—"ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, কিন্তু চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালকদিগকে আকর্ষণ করিলেন। এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সম্বন্ধ কেহ কখনও দেখে নাই।" কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষাদানের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পরও ডিরোজিও ছাত্রদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং তাদের সামনে জ্ঞানের নতুন দরজা উন্মুক্ত করার চেষ্টা করতেন। ডিরোজিওর ছাত্র ও উনিশ শতকের প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র বলেছিলেন—ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের যাবতীয় পাপ মুক্ত করে সবদিকে গুণান্বিত করে তোলার জন্য তাদের নানা ধরনের নতুন চিন্তার খোরাক জোগাতেন। প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলি উল্লেখ করে তিনি ছাত্রদের সামনে ন্যায়বোধ, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতেন। হিউমের সন্দেহবাদী দর্শনের (scepticism) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। উপযোগবাদী দর্শনের প্রভাব থেকেই তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের প্রথা ও রীতিনীতিগুলিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। ১৮২৮-২৯ সাল নাগাদ তিনি তাঁর ছাত্রদের সহযোগিতায় 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি ডিবেটিং সোসাইটি তৈরি করেন। এখানে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হত। জন্মসূত্রে ইউরেশিয়ান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে ভারতীয় বলে দাবি করতেন এবং ভারতবর্ষের প্রতি তিনি তাঁর ছাত্রদের গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের আর পাঁচজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর মতো তিনিও পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে কোনো সমালোচনা না করে গ্রহণ করাকেই পরম সত্য বলে মনে করতেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন—ভারতের এক গৌরবান্বিত অতীত ছিল, কিন্তু সেই গৌরবছটা এখন ম্রিয়মাণ; এক সুগভীর অবক্ষয় ভারতীয় সমাজকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রাস করেছে। একমাত্র পাশ্চাত্য সাহায্যই ভারতবর্ষকে বর্তমান অধঃপতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে।

সমাচার চন্দ্রিকার সমালোচনা থেকে মনে হয় যে ডিরোজিওর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ছাত্ররা হিন্দু সমাজের জাতপাত ব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের

তাঁর ছাত্ররা চোর, ভণ্ড এবং মূর্খ হিসাবে অভিহিত করতেন। তাঁরা রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের 'আধা উদারপন্থী' (Half Liberals) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণদের পয়সা দেন এবং বাড়িতে পুজো-পার্বণ করেন। ডিরোজিওর ছাত্রদের ডিরোজিয়ান বা 'নব্যবঙ্গ' (Young Bengal) বলা হত। ডিরোজিওর ছাত্র নব্যবঙ্গ মাসিক *বেঙ্গল হরকরা* পত্রিকার সম্পাদককে পাঠানো চিঠিতে ১৮৩১ সালের ৩ আগস্টের লিখেছিলেন—তিনি হিন্দুধর্মকে ঘৃণার চোখে দেখেন। আর এক ডিরোজিয়ান কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী রামমোহনের বক্তব্যকে 'অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর' (vague and confusing) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন তাঁর *The Persecuted* নাটকের অন্যতম চরিত্র বানিয়ালাল-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন—সনাতন এবং উদারপন্থী এক ছাদের নীচে সহাবস্থান করতে পারে না এবং তাদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ১৮৩০ সালে পার্থেনন (Parthenon) বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাছাড়া ডিরোজিও *হেসপেরাস* ও *ক্যালকাটা লিটেরারী গেজেট* নামে দুটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন বলেও জানা যায়। পার্থেনন পত্রিকায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৩০ সালের ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনার সমর্থনে এবং হিন্দু সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখেন। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসনের সক্রিয় বিরোধিতায় পার্থেনন পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩০ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজের এক ছাত্র *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকায় প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সমালোচিত করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সমালোচনা এদেশের ঔপনিবেশিক শাসকবর্গকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর ডিরোজিয়ানরা কলকাতার টাউন হলে জুলাই বিপ্লবের বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন এবং প্রায় ২০০ জন নাগরিক এই সভায় যোগ দেন। ২৫ ডিসেম্বর একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি মনুমেন্টের চূড়ায় ফরাসি বিপ্লবের তেরঙ্গা পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। অনুমান করা হয়েছিল যে এটি নব্যবঙ্গদের কাজ। গোঁড়া ভারতীয় সমাজ ডিরোজিয়ানদের অধার্মিক ও চরমপন্থী কার্যকলাপ মেনে নিতে পারেনি। ডিরোজিওর শিষ্যদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বলা হতে লাগল যে ডিরোজিয়ানরা প্রকাশ্যে শাস্ত্রবর্জিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন এবং স্তোত্র বা মন্ত্রপাঠের সময় তাঁরা হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্য থেকে আবৃত্তি করেন। সংবাদ প্রভাকর ও সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা দুটি নব্যবঙ্গদের বিধর্মী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং অভিযোগ করে যে এক ভবঘুরে ফিরিঙ্গির অনুকরণ করে এরা হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করতে চলেছে।

ডিরোজিও কর্তৃক প্রচারিত তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ কিন্তু রাধাকান্ত দেব এবং রামমোহন রায় পরিচালিত অপাতবিরোধী গোষ্ঠী দুটিকেই ক্ষুব্ধ করেছিল। এই বিরোধিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং ডিরোজিও কর্তৃক প্রচারিত নাস্তিকতার বিরুদ্ধে হয়ে মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ কলেজের কাছেই অবস্থিত কলেজস্কোয়ার অঞ্চলে নিজ বাসভবনে খ্রিস্টান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রাধাকান্ত দেব হিন্দু কলেজের পরিচালন

Scanned with CamScanner

সমিতিতে যুক্ত থাকার সুবাদে ডিরোজিওকে শিক্ষকের পদ থেকে বিতাড়িত করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীরা যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁদের আগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে ডিরোজিও প্রচারিত নাস্তিকতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন ও হার সমাজকে নাস্তিকতার প্রভাবমুক্ত করার জন্য ধর্মনির্ভর শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে কলেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে সমস্ত বিধর্মী কার্যকলাপের মূলে রয়েছেন ডিরোজিও। তাই তাঁরা ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে এরপর থেকে কলেজের কোনো শিক্ষকই হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করতে পারবেন না। ১৮৩১ সালের ২৫ এপ্রিল ডিরোজিও তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। এইচ. এইচ. উইলসনকে পাঠানো এই পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেছিলেন—তিনি ছাত্রদের দর্শন বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রতিটি সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি যাচাই করে নেবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন; ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত আলোচনা করার সময় তিনি ক্লিনথিস ও ফিলোর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে হিউম ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন সেগুলি এবং ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট ও টমাস রিড যে পদ্ধতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেছিলেন, সেগুলি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের মুক্তমনা করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং শিক্ষক হিসাবে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের বৌদ্ধিক প্রয়াস ফুলের পাপড়ির মতো উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর ছাত্ররা সবকিছুর ঊর্ধ্বে সত্যকে স্থান দিতে শিখেছে। হিন্দু কলেজের শিক্ষকের পদ থেকে বিতাড়িত হবার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২২ বছর বয়সে ডিরোজিও মারা যান। যদিও ঔপনিবেশিক শাসনের কুফলগুলি ডিরোজিও সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত অন্ধবিশ্বাস ছিল, তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে তিনি তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আঘাতে হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যগত কুপ্রথাগুলিকে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই বিপদগ্রস্ত করে তুলেছিলেন। ডিরোজিও মারা গেলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী দশকগুলিতে বাংলার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার জন্য তাঁর ছাত্ররা থেকে গেলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের বিকাশের গতি নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁর ছাত্ররাই। ডিরোজিওর লেখা কবিতার মধ্যে তাঁর ছাত্রদের সম্পর্কে আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছিল :

> Your hand is on the helm—guide on young men
> The bark that's frightened with your country's doom
> Your glories are budding; they shall bloom.

ডিরোজিওর ছাত্রদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল—কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং রামতনু লাহিড়ী। যৌথভাবে এঁদের নব্যবঙ্গ (Young Bengal) বলে আখ্যায়িত করা হত।

ডিরোজিওর কবিতায় ভারতের গৌরবময় অতীত এবং অবক্ষয়িত বর্তমানের কথা বলা হয়েছিল। তাঁর ছাত্ররাও সমসাময়িক ভারতবর্ষের অধঃপতনে মর্মস্পর্শী বেদনা অনুভব করেছিলেন। তাঁরা ভারতবাসীকে কুসংস্কার মুক্ত করে গড়ে তুলে ভারতের হৃত-গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ১৮৩১ সালে এই নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী ইংরেজিতে *Enquirer* এবং বাংলায় জ্ঞানান্বেষণ নামে দুটি পত্রিকা বের করেছিলেন। *Enquirer* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"হৈ চৈ এবং বিভ্রান্তি ছাড়া কোনো মানুষের সংস্কার সাধন সম্ভব নয়। সংস্কারের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে হিংস্র দমননীতি না চালালে হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা যাবে না। আমরা সেই দায়িত্বই গ্রহণ করেছি।" যদিও নব্যবঙ্গরা কিছুদিনের জন্য কলকাতা শহরে হৈচৈ বাধিয়ে তুলেছিলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজের কর্তাব্যক্তিরাও তাঁদের ওপর সামাজিক বহিষ্কার আরোপ করেছিলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের সুর নরম হয়ে গিয়েছিল। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর নেতৃত্বের সংকট এবং সুবিন্যস্ত কর্মসূচির অভাব তাঁদের কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল। সুশোভনচন্দ্র সরকার লিখেছেন—ডিরোজিয়ানরা তাঁদের শিক্ষকের স্মৃতির প্রতি শেষপর্যন্ত অনুগত ছিলেন এবং নিজেরা পারস্পরিক সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু নব্যবঙ্গদের পরবর্তী কার্যকলাপ বিচার করলে দেখা যাবে যে অধ্যাপক সরকারের এই বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক নয়। ১৮৩২ সালের আগস্ট থেকে ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, আনন্দচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ক্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ডাফ সন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিলেন—অল্পবয়সী ছেলেদের মধ্যে নাস্তিকতার প্রভাব ১৮৩২ সাল থেকেই কমতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই ডিরোজিও প্রচারিত নাস্তিকতার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে এবং তাঁর ছাত্ররা ধর্মের বিরুদ্ধে ফিলোর যুক্তিগুলি ভুলতে শুরু করেন। সময় অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে, নব্যবঙ্গদের অনেকেই হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে ফিরে যান, বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৬০-এর দশকে একজন অনুগত হিন্দুর মতো অযোধ্যায় বসবাস করতে থাকেন এবং অযোধ্যার এক ব্রাহ্মণ-কন্যার সঙ্গে নিজপুত্রের বিবাহ দেন। ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে রাধাকান্ত দেবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন রামকমল সেন। সেই রামকমল সেনের জীবনী লিখতে গিয়ে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন রামকমল যে ধর্মে বিশ্বাস করতেন তা নব্যবঙ্গদের বিধর্মী আচরণের থেকে অনেক ভালো। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ব্যাপারটি ডিরোজিয়ানদের কাছে ক্রমশই একটি সংবেদনশীল বিষয় হয়ে উঠেছিল। নব্যবঙ্গদের প্রচেষ্টায় ১৮৩৮ সালে 'সোসাইটি ফর অ্যাকুইজিশন অফ্ জেনারেল নলেজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানে নিয়ম করা হয়েছিল যে-কোনো ধর্মীয় বিষয় এখানে আলোচিত হবে না। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তার *Complexities of Young Bengal* প্রবন্ধে অত্যন্ত সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন—নব্যবঙ্গরা ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে স্থায়ী কোনো প্রভাব রেখে যেতে পারেননি।

উনবিংশ শতকের জাগরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নারীদের প্রগতি ও নারীমুক্তি। নারীদের মধ্যে শিক্ষার নিষেধাজ্ঞা—প্রভৃতি নানা বিষয়ে সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা উনিশ শতকের বাংলায় চলেছিল। নারী প্রগতি সংক্রান্ত বিষয়ে নব্যবঙ্গদের অনেকেই সক্রিয়

Scanned with CamScanner

ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রামগোপাল ঘোষ তাঁদের সামাজিক কাজকর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন—"যে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে না সে একজন গোঁড়া; যে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না সে একজন নির্বোধ; এবং যে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না সে একজন ক্রীতদাস" (He who will not reason is a bigot ; he who cannot is a fool ; and he who does not is a slave)। নব্যবঙ্গদের সামাজিক কার্যাবলির প্রধান মাধ্যম ছিল সাংবাদিকতা, *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকার নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এই পত্রিকায় বহুবিবাহ করেছেন এমন কুলীনদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। রসিককৃষ্ণ মল্লিক বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৪১ সালের অক্টোবর মাসে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে প্রকাশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে *Bengal Spectator* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন রাধানাথ শিকদার তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর কলমের জোর ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা কোনো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধেই সংগঠিত প্রচার অভিযান গড়ে তুলতে পারেননি। ঐতিহাসিক অনিল শীল নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর সমালোচনা করে বলেছিলেন—তাঁরা ছিলেন জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন (They lived on ivory towers.)। অধ্যাপক শীলের এই বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে। নব্য ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬০ সালে *Young Bengal. This is for you* নামে একটি ছোটো পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তিনি নব্যবঙ্গদের সমালোচনা করে বলেছিলেন তাঁরা বড়ো বড়ো কথা বলেন অথচ সেই অনুযায়ী কাজ করেন না। শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে তাঁরা নানা তত্ত্বের অবতারণা করেন, কিন্তু সেগুলির বাস্তব প্রয়োগ তাঁরা করেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। ১৮৩১ সালে *Reformer* পত্রিকায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করার গুরুত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছিল। ১৮৩৩ সালের মার্চ মাসে *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায় একই কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে তাঁরা কোনো পদক্ষেপই নেননি। তাঁরা বুঝতেই পারেননি যে ইংরেজি ভাষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ তাঁদের ক্রমশ জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'সোসাইটি ফর অ্যাকুইজিশন অফ্ জেনারেল নলেজ'-এ আলোচিত ২৪টি প্রবন্ধ সংগৃহীত রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি প্রবন্ধ মাত্র বাংলায় এবং বাকি ১৮টি ইংরেজিতে লেখা। ১৮৩৯ সালে জর্জ থম্পসন প্রতিষ্ঠিত 'লন্ডন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি'র অনুকরণে ডিরোজিয়ানরা ১৮৪৩ সালে কলকাতায় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভাগুলির যাবতীয় আলাপ-আলোচনা ইংরেজি ভাষায় হত। ডিরোজিয়ানরা তাঁদের শিক্ষকের থেকেও অনেক বেশি মেকলেপন্থী

ছিলেন। ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে তাঁরা কোম্পানির অবাধ বাণিজ্যনীতি ও ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় অর্থনীতিকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল, তা বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন উদয়চন্দ্র আঢ্য, যিনি বাংলা ভাষার উন্নতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৮৩৮ সালে তিনি লিখেছিলেন—যে মুহূর্তে এদেশের মানুষ নিজের ভাষা ভালো ঠিকমতো শিখতে পারবে, সে মুহূর্তে তাঁরা দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করে নিজেদের দেশের শাসক হবার দক্ষতা অর্জন করবে (............only when the people of this country learn prop-erly the language of this country—then and then alone will they acquire that efficiency which can enable them to shake off the present slavery and become master of their own land.)। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার জাগরণের শরিক অনান্য সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীরা উদয়চন্দ্র আঢ্যের যুক্তিবাদী বক্তব্যের সুগভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি।

১৮৪৩ সালের এপ্রিল মাসে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি'র উদ্বোধনী ভাষণে রামগোপাল ঘোষ বলেছিলেন—ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন চিরজীবী হোক, এই তাঁর আন্তরিক কামনা। ভারতবর্ষের সাথে ব্রিটিশ জনগণ তথা ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক ছিন্ন হোক, এমন কোনো কাজ তিনি সমর্থন করবেন না। আর এক ডিরোজিয়ান রসিককৃষ্ণ মল্লিক অবশ্য পুলিশের দুর্নীতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে কৃষকের দুরবস্থা, কোম্পানি সরকারের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানি সরকারের অধীনে তিনি ১৮৩৭ সালে ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। ১৮৪৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির *বেঙ্গল হরকরা* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই শাসনকে মুসলমান শাসনের থেকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করতেন। মহেশচন্দ্র দেব *'Sketch of the Condition of Hindoo Women'* নামে লেখায় হিন্দুশাস্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও মন্তব্য করেন—মুসলমান সম্রাটদের স্বেচ্ছাচারিতার পরিপ্রেক্ষিতেই হিন্দু রমণীরা তাঁদের বিভিন্ন অধিকার হারিয়েছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র নীলচাষিদের খাজনা ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাকে এবং জমিদার-বিরোধী কৃষক বিরোধী কৃষক প্রতিরোধ সংগ্রামকে নিন্দা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলার জমিদারেরা কৃষকদরদি হয়ে উঠেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৪০-এর দশক থেকেই নব্যবঙ্গদের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। কৃষ্টদাস পাল ১৮৫৬ সালে *Young Bengal Vindicated* নামে পুস্তিকায় লিখেছিলেন—নব্যবঙ্গরা কখনোই যাবতীয় হিন্দু প্রথার নিন্দুক বা শত্রু নয়। তাঁরা সাহস ও স্বাধীনতার পূজারি। নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর তরুণ সদস্যরা সরকারি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোম্পানির রাজের প্রতি পূর্ণমাত্রায় অনুগত হয়ে পড়ার সঙ্গেই তাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগুন বাংলাদেশে প্রজ্বলিত না হতে দেবার জন্য ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। সরকারকে

Scanned with CamScanner

নানাভাবে সাহায্য করার পুরস্কার হিসাবে তিনি অযোধ্যার শংকরপুরের তালুকদারি পেয়েছিলেন এবং ১৮৭১ সালের 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৩৫ সাল থেকেই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং এই গ্রন্থাগারের সম্পাদক ও কিউরেটর হিসাবে কাজ করেছিলেন। রাধানাথ শিকদার জরিপ দপ্তরে কাজ নেন এবং হিমালয়ের উচ্চতা মেপে বিখ্যাত হন। রামতনু লাহিড়ী একজন স্কুল শিক্ষক হন। রামগোপাল ঘোষ ব্যবসা করতেন। মাধবচন্দ্র, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দ বসাক ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং এঁরা সকলেই নিজ নিজ কাজে সততা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

নব্যবঙ্গদের ব্যর্থতার দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে কৃষ্টদাস পাল সংক্ষেপে বলেছিলেন "বড়ো বড়ো কথা বলা এবং বাস্তবে কিছু না করা" (mere prattle and no practice) ছিল তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। বিনয় ঘোষ বলেছেন—নব্যবঙ্গরা সুবিন্যস্ত আদর্শের ভিত্তিতে কোনো দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। অহেতুক তত্ত্বের কচকচানির ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে ভারতীয় সমাজে তাঁরা কোনো স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারেননি। তবে একটা সময় পর্যন্ত তাঁরা হিন্দু সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের সততা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকের মধ্যেই প্রাচীনপন্থা ও হিন্দুত্ববাদী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা তাঁদের উদ্দেশ্যকে সফল হতে দেয়নি। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার বলেছেন—তাঁদের মূল দুর্বলতা ছিল এই যে তাঁরা নিজেদের পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রভাবে অত্যাধুনিক বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় তা যে সম্ভব নয় এই সত্য তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। একদিকে তাঁরা বুর্জোয়া উদারপন্থার সমর্থক ছিলেন অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থরক্ষাকারী অবাধ বাণিজ্যনীতিকে তাঁরা প্রশংসা করেছিলেন। ডিরোজিওর অনুগামী নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর সবথেকে বড়ো ব্যর্থতা ছিল এখানেই।

৮.৪.৩ রাধাকান্ত দেব

রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) ছিলেন ক্লাইভের মুন্সি এবং শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র। ইংরেজ শাসনের সূচনার ফলে বাংলাদেশে যে নয়া অভিজাততন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, রাধাকান্ত দেব ছিলেন তার যথার্থ প্রতিনিধি। বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতে যখন প্রাচ্যবাদীদের অপরিমেয় প্রভাব চলেছিল তখনই রাধাকান্ত দেবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই পাশ্চাত্যবাদ ও মেকলেতন্ত্রের হাতে প্রাচ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার পরাভব দেখতে পেয়েছিলেন। রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন চেয়েছিলেন প্রাচ্যবাদী শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশ। কিন্তু রামমোহন রায়ের অনুগামী অভিজাত গোষ্ঠী এবং হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র পুরোপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। কোম্পানি সরকার নিজের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করে। বিভিন্ন ভাষায় রাধাকান্ত দেবের পারদর্শিতা ছিল। ফলে কলকাতা শহরের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে তাঁর সুবিধা হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

৮.৪.৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উনিশ শতকের জাগরণে যেসব মনীষী বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সে যুগের আর পাঁচজন ইংরেজি শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষের থেকে তাঁর শ্রেণীভিত্তি ছিল আলাদা। কোনো অভিজাত ভূস্বামী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বীরসিংহ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। ১৮৭২ সালে বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় আসেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ১৮৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার পদে যোগ দেন। সেখানে তিনি ১৮৪৬ সালে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কাজ করেন। তারপর কিছু সময় তিনি অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটানোর পর ১৮৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৮৫১ সালের ২২ জানুয়ারি তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত তিনি এই পদের দায়িত্ব পালন করেন।

সংস্কৃত কলেজে কাজ করার সময় থেকে একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর অবদানের সূত্রপাত। আগে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরা সংস্কৃত কলেজে পড়ার অনুমতি পেতেন। বিদ্যাসাগর ১৮৫১ সালের ৯ই জুলাই এই কলেজের দরজা কায়স্থদের জন্য উন্মুক্ত করেন। ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে যাবতীয় সম্মানিত হিন্দুদের ছেলেরাই এই কলেজে পড়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। ছাত্রদের সামান্য বেতন দিতে হত। কলেজে শৃঙ্খলা এবং উপস্থিতির নিয়মানুবর্তিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। আগে কলেজে হিন্দু পঞ্জিকা নির্দেশিত শুভদিনগুলিতে ছুটি দেওয়া হত। বিদ্যাসাগর যথেষ্ট সাহসিকতা ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে এই নিয়ম বাতিল করে দেন ও বিনিময়ে রবিবার ছুটির বন্দোবস্ত করেন। ১৮৩৫ সাল থেকে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। যদিও ১৮৪২ সালে তা আবার চালু করা হয়, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভালো করে ইংরেজি পড়ানোর উপযোগিতা অনুভব করেছিলেন। বিদ্যাসাগর যে সময় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, তখন সংস্কৃত কলেজ গভীর সংকটে পড়েছিল। এই কলেজ থেকে পাসকরা ছাত্রদের সামনে ভালো চাকরির সুযোগ উন্মুক্ত ছিল না। ফলে দিন দিন কলেজের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পায়। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে সরকার সংস্কৃত কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ্য বিবেচিত করতে স্বীকৃত হয়। ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ বাংলা পাঠশালা এবং ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ব্যর্থ হবার ফলে বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যে মাতৃভাষা ও ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন দরকার। এন. এল. বসাক দেখিয়েছেন—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির পতন রোধ করার তাগিদে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইংরেজি চালু করেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। ফলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার হাত থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার জন্য কলকাতা থেকে বাঁশবেড়িয়াতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরিত করেন। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর জোরের সঙ্গে বলেন যে—কেবল ইংরেজি শিখে ছাত্ররা সুন্দর ও ছন্দময় বাংলায় ভাব প্রকাশ করতে পারবে না। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি শেখানো যায় তবে তারাই বাংলা সাহিত্যের সবথেকে দক্ষ লেখক হিসাবে গড়ে উঠবে। তিনি প্রাচ্য দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন উভয় বিষয়েই ছাত্রদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ. ব্যালেন্টাইন ১৮৫৩ সালে কলকাতায় এসে মন্তব্য করেছিলেন—দুই ধরনের দর্শন পাঠ করলে ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেবে এবং তাদের ধারণা হবে যে সত্য দুরকমের। কিন্তু ১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর ব্যালেন্টাইনের বক্তব্যের উত্তর বলেন—সত্য যে হিন্দু দর্শন পদ্ধতি সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য দর্শনের অগ্রবর্তী ধারণাগুলির সঙ্গে একেবারেই মেলে না। কিন্তু একজন ভালো সংস্কৃত পণ্ডিতের হিন্দু দর্শন জানা জরুরি। তিনি যদি একই সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তবে তাঁর পক্ষে প্রাচীন হিন্দু দর্শনের ভুলভ্রান্তিগুলি ধরা অনেক সহজ হবে। বিদ্যাসাগর সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন পদ্ধতিকে ভ্রান্ত বলে মনে করতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীনই তিনি পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হন। মুগ্ধবোধ প্রভৃতি অপূর্ণাঙ্গ ও ভ্রান্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ হিসাবে বাতিল করা হয়। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের সুবিধার জন্য প্রচুর বই লেখেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—*সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, ঋজুপাঠ্য, কথামালা, নীতিবোধ, চরিতাবলী* ও *বোধোদয়*। ১৮৫৩ সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজিকে আবশ্যিক বিষয় করা হয়। মিলের তর্কশাস্ত্রকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আগে গণিত শিক্ষার জন্য ভাস্করাচার্যের *লীলাবতী* ও *বীজগণিত* পড়ানো হত। বিদ্যাসাগর বই দুটি বাতিল করেন ও ইংরেজি গণিত গ্রন্থ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন।

মেকলে মিনিটের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। ১৮০৩ সালে উইলিয়াম ওয়ার্ড লিখেছিলেন—প্রায় সব গ্রামেই পড়া, লেখা ও প্রাথমিক অঙ্ক শেখানোর মতো বিদ্যালয় আছে। ১৮৩৫ সালে আডামের রিপোর্ট থেকে জানা যায়—সে সময় বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ স্কুল ছিল এবং তাঁর অর্ধেকই গ্রামে অবস্থিত। কিন্তু ১৮৫৪ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এফ. জে. হ্যালিডে তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন—শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেশীয় ভাষার শিক্ষার যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসকদের স্বার্থবাহী হয়ে ওঠার ফলে মাতৃভাষায় শিক্ষা তার গুরুত্ব হারিয়েছিল। তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষা ছিল অসম্ভব ব্যয়সাপেক্ষ। বিদ্যাসাগর এই সমস্যা বুঝতে পেরেছিলেন। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে বিদ্যাসাগর নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫টি মডেল স্কুল তৈরি করেন। ১৮৫৫ সালে জুলাই মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণে একটি 'নর্ম্যাল' স্কুল তৈরি করেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন বাচস্পতিকে এই স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে যদিও সমস্ত মানুষকেই শিক্ষিত করে তোলা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যে

Scanned with CamScanner

সমস্ত পরিমাণ অর্থ সরকার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করে, তা দিয়ে সকলকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়। তাই তিনি ১৮৫৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর জে. পি. গ্রান্টকে একটি চিঠিতে লেখেন—এরকম একটি ধারণা এদেশে এবং ইংল্যান্ডে গড়ে তোলা হয়েছে যে সরকার উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অনেক কিছুই করছে এবং এখন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা দরকার। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি তা নয়। উচ্চশ্রেণীর মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য সরকারের আগে একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচি নেওয়া উচিত।

প্রকৃতপক্ষে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। মাত্র কয়েকটি জেলার নিম্নবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর সামনে দেশীয় ভাষায় শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করেছিল। এ. পি. হাওয়ার্ড ১৮৬৬ সালে তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন—উচ্চশিক্ষার পেছনে সরকার যথেষ্ট ব্যয় করছে, কিন্তু সে তুলনায় দরিদ্র মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য সরকারি প্রচেষ্টা খুবই কম এবং নিম্নতম স্তরের গ্রামীণ স্কুলগুলির পেছনে সরকারি ব্যয় নগণ্য। বিদ্যাসাগর বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি শিক্ষাবিস্তারের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। অশোক সেন তাঁর *Vidyasagar and his Elusive Milestones* গ্রন্থে সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন—বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া এবং বাংলার ছোটো শহর ও গ্রামগুলির নিম্নবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর (poorer gentry) মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ১৮৪৯ সালের ৭ মে শিক্ষা কাউন্সিলের তদানীন্তন সভাপতি জে. ই. ডি. বেথুনের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় ২১ জন ছাত্রী নিয়ে হিন্দু নারী বিদ্যালয় গঠিত হয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কলকাতার বাড়িতে এই স্কুল বসত। বেথুনের উদ্যোগকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং নারীশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বিদ্যালয় পরিদর্শক থাকাকালীন বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-৫৮ সাল নাগাদ বর্ধমান, নদিয়া ও হুগলি জেলায় নিজের খরচে ৩৫টি মেয়েদের স্কুল তৈরি করেন। এই স্কুলগুলিতে ১৩০০০ ছাত্রী পড়াশুনা করত। বিস্তর লেখালেখির পর এই স্কুলগুলি খুলতে যে ব্যয় হয়েছিল সেই ভার বহন করতে সরকার স্বীকৃত হয়, কিন্তু একই সঙ্গে জানিয়ে দেয় যে এই স্কুলগুলির জন্য কোনো নিয়মিত অনুদান সরকার পাঠাবে না। পরবর্তীকালেও বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বেশকিছু মেয়েদের স্কুল তৈরি করেন। ১৮৯০ সালে নিজগ্রাম বীরসিংহে মা ভগবতী দেবীর স্মৃতিতে ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর এ ব্যাপারে সর্বশেষ প্রয়াস। একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে ১৮৬১ সালে তিনি ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন।

বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে বিদ্যাসাগরই যে কেবলমাত্র এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন একথা

বলা যায় না। ১৮৩৭ সাল নাগাদ কলকাতার একাধিক পত্র-পত্রিকায় বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বম্বেতেও এ বিষয়ে কিছু ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ সালের ২৫ নভেম্বর *দি রিফরমার* (The Reformer) পত্রিকায় বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করে প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। ১৮৪২ সালের জুলাই মাসে *বেঙ্গল স্পেকটেটর* (Bengal Spectator) পত্রিকাতেও বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে 'The Marriage of Hindu Widows' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের তীব্র সমর্থক ছিলেন। ১৮৫০-এর দশকে তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলনের দাবিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। ১৮৫৩ সালে তিনি বিধবা-বিবাহের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখেন এবং বিধবা-বিবাহ যে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত একথা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হন। বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রসম্মত বৈধতা প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগর 'পরাশর সংহিতা' ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের সমর্থনে এক হাজার সই সংগ্রহ করেন এবং সরকারের কাছে বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করার দাবিতে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। এই বিধবা-বিবাহ প্রচলনের দাবির সঙ্গে তৎকালীন হিন্দু সমাজের আর একটি কুপ্রথা বাল্যবিবাহ ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা অনেক সময় খুব কম বয়সেই বিধবা হতেন এবং বাকি জীবন তাঁদের বৈধব্যের গ্লানি ও নানা ধরনের কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাটাতে হত। এই অল্পবয়সী মেয়েদের দুঃখমোচনের জন্যই বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যরা বিধবা-বিবাহের প্রচলন চেয়েছিলেন। ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে বাল্যবিধবাদের দুঃখমোচনের জন্যই এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল, বর্ষীয়সী বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারে কেউই বিশেষ উদ্বিগ্ন নয়। ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই কোম্পানি সরকার বিধবা-বিবাহের সমর্থনে একটি আইন পাস করে। ঐ বছরের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহ যাতে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তাই বিদ্যাসাগর প্রচুর কুলীন ব্রাহ্মণকে এই বিবাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং এই প্রয়াসকে সফল করার জন্য তিনি ১০ হাজার টাকা খরচ করেন। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি মোট ৬০টি বিধবা-বিবাহের আয়োজন করেন এবং এই উপলক্ষ্যে তিনি ৮২ হাজার টাকা খরচ করেন। ১৮৬০ ও ৭০-এর দশকে শশীপদ ব্যানার্জীর উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজও বেশকিছু বিধবা-বিবাহের আয়োজন করেছিল। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ বলেছেন—বিধবা-বিবাহের বিষয়টি সাধারণত বিধবাদের পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন সমর্থন করতে না। অনেক বিধবাকে তাঁদের বাড়ি থেকে চুরি করেও নিয়ে আসা হত। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহে ইচ্ছুক পাত্রদের প্রচুর টাকা দিতে হত। এই টাকার জোগাড় করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর খরচ হয়ে গিয়েছিল। আর্থিক দিক দিয়ে নিঃশেষিত বিদ্যাসাগর একসময় হতাশ হয়ে ছোটোভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লিখেছিলেন যে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধবা-বিবাহের পেছনে আর অর্থব্যয় করবেন না। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মারাত্মক ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। অনেকে তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে বিধবা-বিবাহের প্রয়াসকে সফল করার জন্য তাঁরা তাঁকে চাঁদা দেবেন। কিন্তু তাঁরা কথা রাখেননি। তিনি এতটাই দরিদ্র হয়ে

Scanned with CamScanner

পড়েন যে তিনি বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিডনের কাছে তাঁকে একটি উপযুক্ত চাকরি দেবার আবেদন করেন। শেষপর্যন্ত তিনি অবশ্য সরকারি চাকরি গ্রহণ করেননি। কিন্তু বই লিখে ও নানাবিধ অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি অর্থ উপার্জন করেন এবং ব্যক্তিগত ঋণগুলি শোধ করেন। কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ এতই প্রখর ছিল যে ঋণমুক্ত হবার জন্য তিনি কারও সাহায্য বা দান গ্রহণ করেননি। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় যে তিনি বিধবা-বিবাহের ব্যাপারটি নিয়ে অসম্ভব হতাশ হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল।

সরকার কর্তৃক বিধবা-বিবাহের সপক্ষে আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহের বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলায় বিদ্যাসাগরের এবং পশ্চিম ভারতে বিষ্ণু শাস্ত্রীর প্রয়াস মোটামুটি ব্যর্থ হয়েছিল বলা চলে। ১৮৬৬ সালে বম্বেতে Widow Remarriage Association নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তাদের উদ্যোগেও খুব বেশি বিধবা-বিবাহ হয়নি। কলকাতার একটি সাময়িক পত্রিকা স্পষ্টই লিখেছিল—বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রয়াস পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। সে সময় এমনও অনেক ব্যক্তি ছিল যারা বিধবা-বিবাহ করেছিল টাকার লোভে এবং বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা না পেলে তারা তাদের পত্নীকে পরিত্যাগ করবে বলে ভয় দেখাত। তাছাড়া উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ কখনোই গ্রহণীয় হয়নি। এমনকি তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষও উচ্চবর্ণের দ্বারা ধিক্কৃত হবার ভয়ে বিধবা-বিবাহ করতে চাইতেন না। হান্টারের *Statistical Account* থেকে জানা যায়, মেদিনীপুরের জমিদারেরা যেসব পরিবারে বিধবা-বিবাহ হয়েছে, তাদের ওপর অবৈধ কর বা আবওয়াব বসিয়েছিলেন। বিধবা-বিবাহের প্রচলনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর প্রয়াসকে সফল করার জন্য হিন্দুশাস্ত্রের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শাস্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মনে হতে পারে প্রাচীন শাস্ত্রগুলি নির্দেশিত যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক ও রীতিনীতিগুলি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু একথা বিদ্যাসাগর নিজেও বিশ্বাস করতেন না। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য শাস্ত্রের ওপর অতিরিক্ত পরিমাণে নির্ভর না করে মানবিক ও যুক্তিবাদী দিকগুলি যদি শুধু তুলে ধরা হত তবে হয়তো এই আন্দোলনের চরিত্র আরও ব্যাপক রূপ নিতে পারত।

বহুবিবাহ রোধ করার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের অবদান উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। একাদশ শতকে রাজা বল্লাল সেনের আমলে বাংলায় কৌলীন্য প্রথার সূত্রপাত। কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথা উনবিংশ শতকে প্রথম সমালোচিত হয়েছিল ডিরোজিও শিষ্য নব্যবঙ্গদের দ্বারা। ১৮৩৬ সালে *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায় এ বিষয়ে তারা প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ১৮৫০-এর দশকে কিশোরীচাঁদ মিত্র কুলীনত্ব ও কুলীন সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন *কুলীন কুলসর্বস্ব* নামে কুলীনতন্ত্রকে পরিহাস করে একটি প্রহসনমূলক নাটক লেখেন। এই নাটক প্রথম চুঁচুড়ায় মঞ্চস্থ হয় ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৫৫ সালে বর্ধমানের মহারাজা বহুবিবাহ প্রথা যে এক

গভীর সামাজিক ব্যাধির জন্ম দিয়েছে, একথা জানিয়ে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাছে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। ১৮৫৭ সালে লেফটেন্যান্ট গভর্নর জে. পি. গ্রান্ট এ বিষয়ে একটি বিল উত্থাপন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বহুবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু আবার ১৮৬৩ সালে সরকারের কাছে বহুবিবাহ প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানিয়ে বেশ কিছু আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। পরিস্থিতি বিচার করার জন্য সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করে। ১৮৬৬ সালে ভারতীয় ও ইংরেজ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি তৈরি হয়। কিন্তু জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, রামনাথ ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্র বলেছিলেন যে কুলীনদের বহুবিবাহ ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের তাঁরা তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই প্রথা রোধ করার ব্যাপারে একটি সামাজিক আইন চেয়েছিলেন। তিনি *বহুবিবাহ* নামে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন এবং পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান যে ১৮৬৫-১৮৭১ সালের মধ্যে ১২০ জন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এই ইস্তাহারেও তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করেছিলেন ও বলেছিলেন যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে এই প্রথা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রের আইন চেয়েছিলেন এবং এই প্রথাকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করতেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। উনিশ শতকীয় জাগরণের আর একজন পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিন্তু তাঁর সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের এই মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—"বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্প দিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।" উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বহুবিবাহের চল যে ক্রমাগত কমে আসছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য অত্যন্ত সঠিক। ১৯০৯ সালে ও'ম্যালি (O'Mally) হাওড়া জেলার বিবরণ লিখতে গিয়ে বলেছিলেন—"কিছুটা অর্থনৈতিক কারণে এবং প্রধানত জনমতের চাপে বহুবিবাহ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে" (Polygamy is fast disappearing partly for economic causes, but chiefly from the pressure of public opinion.)।

বহুবিবাহ ছাড়া বাল্যবিবাহ ছিল তার একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি যার শিকার হয়েছিল ভারতীয় নারীরা। বাল্যবিবাহের তীব্র সমালোচক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বাল্যবিবাহ রোধ করতে প্রয়াসী হন এবং তাঁর এই প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসাবে সরকার ১৮৬০ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১০ বছর ধার্য করে। বাল্যবিবাহ রোধ করার ক্ষেত্রে তদানীন্তন সমাজের অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সে যুগের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাল্যবিবাহের উগ্র সমর্থক ছিলেন। সতীত্ব সংক্রান্ত ঐতিহ্যগত

Scanned with CamScanner

সনাতন ধারণা তাঁর মধ্যে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত ছিল। *দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা* বাল্যবিবাহ বন্ধ করার প্রয়াসের বিরোধিতা করে লিখেছিল—একজন ভারতীয় নারীর কর্তব্য বিবাহের পর তার স্বামীর সঙ্গে একীভূত হওয়া। অল্পবয়সে মেয়েদের বিবাহ না হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সঠিক বোঝাপড়া ও সংমিশ্রণ গড়ে ওঠে না। এটাই ছিল উনিশ শতকীয় জাগরণের সময় বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা। এই মূলস্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের মতো একটি সামাজিক ব্যাধিকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ১৮৯১ সালে সরকার Age of Consent Bill-এর মাধ্যমে মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে ১২ বছর করেন। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী এই বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। কেবল ব্রাহ্মরা ও তাঁদের মুখপত্র *Indian Mirror* পত্রিকা এই বিলের সপক্ষে শিক্ষিত মানুষকে আনতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষের মুখপত্র *Hindu Patriot* পত্রিকা লিখেছিল—আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাল্যবিবাহ প্রয়োজনীয়। এই প্রথা উচ্ছেদ করা হলে আমাদের যৌথ পরিবার ও জাতপাত প্রথা ধ্বংস হবে (Early marriage is necessary institution for the preservation of our social order. Its abolition would destroy the system of joint family and caste.)। বাল্যবিবাহ রোধ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সকলেই বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক সুশীলকুমার দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের আগে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্য রচনায় মার্জিত শৈলী পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায় কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে গিয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সুবিন্যস্ত রচনাশৈলীতে সেই অস্পষ্টতা দূর হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের গদ্য সংস্কৃত নির্ভর সাধু ভাষা এবং বাংলা চলিত ভাষার অন্তর্বর্তী স্তরে বিচরণ করেছিল—আর এখানেই ছিল তাঁর কৃতিত্ব। বিদ্যাসাগরীয় রচনাশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—ভাব প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সুললিত ছন্দের প্রয়োগ। সুশীলকুমার দে মন্তব্য করেছেন—প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহ এবং প্রকাশনার প্রতি মনোযোগ থেকেই বিদ্যাসাগর সুন্দর গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর রচিত কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' অনুসরণে *শকুন্তলা* এবং ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' অবলম্বনে *সীতার বনবাস* গ্রন্থ দুটিতে তাঁর গদ্য-রচনাশৈলীর চরম দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল। তাছাড়া যতিচিহ্নের (punctuation) বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার এবং একটি বৃহৎ বাক্যকে কতকগুলি উপবাক্যে (clause) বিভক্ত করার রীতি প্রচলনের জন্য বাংলা গদ্য-সাহিত্য বিদ্যাসাগরের কাছে ঋণী।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য সমসাময়িক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের থেকে খুব একটা পৃথক ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের মঙ্গল ইংরেজ শাসনের ওপর নির্ভরশীল। ১৮৭১ সালে তিনি বলেছিলেন—লোভের বশবর্তী হয়ে ইংরেজরা আমাদের দেশ শাসন করতে আসেনি। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এদেশের

সার্বিক মঙ্গলসাধন। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন যে এদেশের কৃষকদের ও কারিগরদের দারিদ্র্যপীড়িত ও শ্রীহীন করে তুলেছিল এবং ইংরেজরা যে এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে ভারতবর্ষকে নিঃশেষিত করেছিল এই সত্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর ইংরেজদের সঙ্গে দীর্ঘকালীন সংস্রবের ফলে ইংরেজ শাসনের গঠনমূলক ভূমিকার (regenerating role) দিকেই তাকিয়েছিলেন, এই শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকার (destructive role) প্রতি তাঁর নজর পড়েনি। সময়ের সীমাবদ্ধতা বিদ্যাসাগরের মতো মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরও তাঁর সমসাময়িক ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মতো মনে করতেন—এই অধঃপতিত জাতি একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই তার নৈতিক উত্তরণ ঘটাতে পারে। তবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে জানা যায় যে জীবনের অন্তিমলগ্নে ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মোহভঙ্গ হয়েছিল এবং তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করতেন।

পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সবক্ষেত্রে হতাশার গ্লানি তাঁকে এতটাই বিধ্বস্ত করেছিল যে শেষজীবনে তিনি নিজেকে শহরে সভ্যতা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যান। ১৮৮০-র দশকে তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্নের একটা বিরাট সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল সাঁওতাল পরগনার কার্মাটার অঞ্চলে অশিক্ষিত সাঁওতালদের সান্নিধ্যে। ১৮৮৬ সালে কলকাতা শহরে যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল, তখন বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছিলেন—"বাবুরা কংগ্রেসের অধিবেশন করছে। তারা নানা দম্ভোক্তি করছে, বড় বড় বক্তৃতা করছে এবং এইভাবে ভারতকে স্বাধীন করবে বলছে। কিন্তু প্রতিদিন যে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও নজর নেই। এই রাজনীতির কি প্রয়োজন?" বিদ্যাসাগর শহরভিত্তিক সংস্কারপন্থী রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে তিনি চরমপন্থী বা র‍্যাডিকাল আদর্শে বিশ্বাস করতেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন মানবহিতৈষী ও মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ। তিনি লক্ষ লক্ষ অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জন্য আন্তরিক বেদনা অনুভব করেছিলেন। জরাক্রান্ত দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁদের সেবা করেছিলেন ও প্রচুর আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন, কিন্তু উনবিংশ শতকে এই বিপুল সংখ্যক অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জমিদার-মহাজন বিরোধী অভ্যুত্থানগুলিতে তিনি তাঁদের পাশে থাকেননি।

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বিদ্যাসাগরকে একজন 'ঐতিহ্যগত আধুনিককার' (Traditional Modernizer) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। কিন্তু এ ধরনের মন্তব্য করে অমলেশ ত্রিপাঠী একজন ব্যক্তির চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির দিকটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চেয়েছেন। অধ্যাপক ত্রিপাঠীর এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে অধ্যাপক অশোক সেন মন্তব্য করেছেন বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা ছিল ঔপনিবেশিক শাসন শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এক 'বিকৃত আধুনিকতা'র (Distorted Modernisation) ছায়ামাত্র। ইংরেজ শাসকদের

Scanned with CamScanner

হাতে এই আধুনিকতার জন্ম হয়েছিল এবং এই আধুনিকতার অর্থ ছিল লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর দারিদ্র্যের বিনিময়ে ইংরেজ জাতির সমৃদ্ধিশালী হওয়া। অসম্ভব নিষ্ঠা, সততা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিদ্যাসাগর কতকগুলি আধুনিক সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের যে স্তরে তিনি বিচরণ করেছিলেন, সে স্তরে তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলি তাঁর সামনে এক বিভ্রান্তিকর মোহজালের (illusion) সৃষ্টি করেছিল। অশোক সেনের মতে— ঔপনিবেশিক শাসনের পরিকাঠামোর মধ্যে বিদ্যাসাগরের যাবতীয় প্রগতিশীল ও আধুনিক সংস্কারের প্রয়াস স্বপ্নালু মরীচিকার মতো মিলিয়ে যেতে বাধ্য ছিল (Vidyasagar was the victim of illusions which he shared with his stage of history.....)। একথা সত্যি যে বিদ্যাসাগর নিজে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যবিরোধী ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন; কিন্তু সমাজের যে শ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি আধুনিক সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন সেই শ্রেণী ইংরেজ সরকার নির্দেশিত সংস্কারকেই যথার্থ আধুনিক সংস্কার বলে মনে করত। ফলে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের কার্যাবলির ক্ষেত্রেও তাঁর যুগের সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন ছিল সুস্পষ্ট।

৮.৫ বাংলার 'নবজাগরণের' প্রকৃতি

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতি ও চিন্তায় যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছিল তাকে বহু সমসাময়িক পণ্ডিত ও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা 'বাংলার নবজাগরণ' (Bengal Renaissance) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার এই 'নবজাগরণ' বা রেনেসাঁর প্রকৃত চরিত্র নিয়ে, এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে এবং আদৌ এটা প্রকৃত নবজাগরণ ছিল কিনা, তা নিয়ে সাম্প্রতিককালের পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সিভিলিয়ান অশোক মিত্র ১৯৫১ সালে যখন আদমশুমার বা Census তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন তখন তিনি বাংলার উনিশ শতকীয় জাগরণকে "তথাকথিত নবজাগরণ" (Socalled Renaissance) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর মতে— চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃপায় লাভবান নয়া জমিদার শ্রেণীর সাধারণ রায়তদের শোষণ করে যে বিপুল সম্পদ আহরণ করেছিল তার একটা বিরাট অংশ তারা কলকাতায় নিয়ে এসে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পেছনে ব্যয় করেছিল। এ ব্যাপারে ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের স্বার্থে তাদের প্রয়াসকে পূর্ণ মদত দিয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। বিনয় ঘোষের মতে বাংলার 'নবজাগরণ' একটি 'অতিকথা' মাত্র। নবজাগরণকে তিনি একটি 'ঐতিহাসিক প্রতারণা' (historical hoax) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সুদৃঢ় অভিমত— "নবজাগরণ হয়নি, যা লেখা হয়েছে, এখনও লেখা হয়, তা অতিকথা মাত্র।" অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন— উনিশ শতকের আধুনিকতা এসেছিল 'সাম্রাজ্যবাদের অভিভাবকত্বাধীনে' (under the tutelage of imperialism)। অম্লান দত্ত অবশ্য বলেছেন—উনিশ শতকীয় নবজাগরণের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার 'মূল্যাশ্রয়িতা ও অসামান্যতা' ছিল। বাংলার 'নবজাগরণ'-

Scanned with CamScanner

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর অঞ্চলে পাগলপন্থী আন্দোলন (১৮২৪-৩৩) তীব্র রূপ নেয়। 'পাগলপন্থী'রা ছিলেন এক বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ। ঐতিহাসিক বিনয়ভূষণ চৌধুরী তাঁর 'ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন' (ইতিহাস অনুসন্ধান-৩) প্রবন্ধে বলেছেন—"এ আন্দোলনের দুটি প্রধান পর্যায়—গোড়ার দিকে জমিদারি অপশাসনের বিরুদ্ধে। এবং ১৮২৪ সালের শেষদিক থেকে পশ্চিমিত জমিদার ও ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। 'পাগলপন্থা'র প্রবর্তক ছিলেন করিম শাহ্। তাঁর মৃত্যুর (১৮২৬) পর তাঁর পুত্র টিপুর আমলেই এই নতুন ধর্মীয় গোষ্ঠী ক্রমেই কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। উইলেম শেন্ডেল (Willem Schendel) *Indian Economic and Social History Review* (এপ্রিল-জুন, ১৯৮৫)-তে Madmen of Mymensingh : Peasant Resistance and the Colonial Process in Eastern India নামে পাগলপন্থী বিদ্রোহের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শেন্ডেলের মতে—পাগলপন্থীরা একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হলেও এই আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা ছিল গৌণ; জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান তিক্ততার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে এই আন্দোলন হয়েছিল।

১৮১০ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে প্রধানত কৃষকদের ওপর বর্ধিত খাজনার দাবি এবং বলপূর্বক নীলচাষকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের কৃষক অভ্যুত্থানগুলি হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং জমিদার শ্রেণীর মিত্রতা একটি সুদৃঢ় ভিত্তি পেয়েছিল। ১৮২৩ সাল থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে নীল আবাদকারী সাহেবদের স্বার্থরক্ষার জন্য বেশকিছু আইন প্রণয়ন করেছিল। দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের ওপর নীল সাহেবদের নিয়ন্ত্রণ কঠোর হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৮৩০-এর দশকের সূচনায় যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, ভারতীয় অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়েছিল। অর্থনৈতিক সংকট গ্রামীণ অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছিল। এই অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এজেন্সি হাউসগুলি ভেঙে পড়ে, কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস পায় এবং ঋণের প্রবাহ স্তিমিত হয়ে আসে। এই অবস্থায় কৃষকদের অর্থকরী পণ্য (cash crops) উৎপাদনে বাধ্য করা হয়। নীলকুঠিগুলি থেকে সামান্য বাদনের বিনিময়ে চাষিরা নীলচাষ করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার একই সময় জমিদারেরা কৃষকদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপিয়েছিলেন। কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বারাসত অঞ্চলে তিতুমিরের নেতৃত্বে এবং ফরিদপুর অঞ্চলে দুদু মিঞার নেতৃত্বে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছিল।

৯.১.১ ওয়াহাবি আন্দোলন

ওয়াহাবি ছিল মুসলমানদের একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর প্রবর্তক ছিলেন আব্দুল ওয়াহাব। তাঁর অনুগামীদের বলা হত ওয়াহাবি। ওয়াহাবিদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনের পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলি অঞ্চলের সৈয়দ আহ্মদ। সৈয়দ আহ্মদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনের (Islamic revivalism) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু

Scanned with CamScanner

তাঁর ধর্মীয় প্রচারের মধ্যে রাজনৈতিক বক্তব্যের উপস্থিতি ছিল স্পষ্ট। তিনি ইংরেজ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন—ভারতবর্ষ দার-উল-হারব বা শত্রুরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলাম বা ধর্মরাজ্যে পরিণত করতে হবে। সৈয়দ আহমদের অনুপ্রেরণায় উত্তর ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নিজের মতাদর্শ প্রচার করতে করতে তিনি ১৮২১ সালে কলকাতায় আসেন। কলকাতার বারাসত অঞ্চলের অধিবাসী মির নিসার আলি সৈয়দ আহমদের প্রভাবে ওয়াহাবি মতাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন (বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এই মির নিসার আলি। তিতুমির নামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ)।

তিতুমির ১৭৮২ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনার নারকেলবেড়িয়ার কাছে চাঁদপুর গ্রামে এক দুস্থ দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি নদিয়ার বিভিন্ন জমিদারের অধীনে লেঠেলের কাজ করেছিলেন। ফলে দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সময় জমিদারি অত্যাচারের স্বরূপ তিনি জানতেন। যৌবনে তিনি হজ করতে মক্কা গিয়েছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে—মক্কাতেই তিতুমির প্রথম ওয়াহাবি নেতা সৈয়দ আহমদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মক্কা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আর জমিদারিতে কাজ করলেন না। দরিদ্র মুসলমান চাষি ও জোলা (তাঁতি) দের মধ্যে তিনি ওয়াহাবি আদর্শ প্রচার করেন এবং তাদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। গোবরডাঙা-নারকেলবেড়িয়া অঞ্চলেই তিনি সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল ধর্মীয় সংস্কারকের। বারাসতের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট কলভিন ১৮৩২ সালে তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—ওয়াহাবিরা ইসলাম ধর্মের অবিকৃত পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। তারা মূর্তিপূজা, বিভিন্ন কুসংস্কার, পিরের পূজা এবং সুন্নি কবরবাদের তীব্র বিরোধী। পোশাক ও সাজসজ্জার দিক দিয়ে তারা অন্যান্য মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র। তারা মাথা কামায় এবং বিশেষ ধরনের দাড়ি রাখে।

তিতুমির ও তাঁর অনুগামীরা অন্যান্যদের তাঁদের ধর্মমতে ধর্মান্তরিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বহুসংখ্যক মুসলমান চাষি এবং জোলা ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের জমিদারিতে পুঁড়া গ্রামে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। বারাসত অঞ্চলের অন্যান্য পার্শ্ববর্তী গ্রামেও এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ওয়াহাবিদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবার ফলে তাঁরা ঐ এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন। এই কর্তৃত্ব সহ্য করতে রাজি ছিলেন না জমিদার কৃষ্ণদেব রায়। ওয়াহাবিদের কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্য তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শে বিশ্বাসীদের দাড়ির ওপর আড়াই টাকা কর ধার্য করেন। কৃষ্ণদেব রায়ের পদক্ষেপে অনুপ্রাণিত হয়ে পার্শ্ববর্তী কুরগাছি এবং নগরপুর অঞ্চলের জমিদারেরাও ওয়াহাবিদের প্রভাব খর্ব করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছ থেকে জোর করে জরিমানা আদায় করতে থাকেন এবং তাঁদের প্রতি নানারকম দুর্ব্যবহার করেন। ওয়াহাবি ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেরা অভিযোগ করেছিল যে জমিদারের লোকেরা কেবলমাত্র তাঁদের কাছ থেকে বলপূর্বক জরিমানা আদায় করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা মাঝেমধ্যেই তাঁদের দাড়ি উপড়ে নিত। দরিদ্র কৃষকেরা এই ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে

মনস্থ করে। কৃষক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে কৃষ্ণদেব রায় তিতুমিরের গ্রাম আক্রমণ করেন এবং তাঁর পাইক ও বরকন্দাজেরা সেই গ্রামের একটি মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে। মসজিদ পোড়ানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেছেন—"সম্ভবতঃ জমিদারের ধারণা ছিল, ওয়াহাবিদের জমায়েত ও শলাপরামর্শের একটা প্রধান কেন্দ্র ও মসজিদ পুড়িয়ে দিলে তাদের সংগঠন বেশ কিছুটা দুর্বল হবে।"

এরপর দ্রুত ঘটে যাওয়া কতকগুলি ঘটনা ওয়াহাবিদের অসন্তোষকে একটি সংগঠিত প্রতিরোধে রূপান্তরিত করে। ওয়াহাবিরা মসজিদ পোড়ানোর ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। কিন্তু জমিদার কৃষ্ণদেব রায় থানার দারোগা রামরতন চক্রবর্তীর সহযোগিতায় মসজিদ পোড়ানোর অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যান। তারপরই তিনি ওয়াহাবিদের দমন করার ব্যাপারে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের হাতে প্রজা দমন করার বিপুল ক্ষমতা দিয়েছিল। বিশেষত 'হপ্তম' অর্থাৎ ১৭৯৯ সালের ৭ নং রেগুলেশন ছিল খাজনা দিতে অনিচ্ছুক বিরোধী প্রজাদের শায়েস্তা করার একটি কার্যকরী অস্ত্র। কৃষ্ণদেব রায় এই অস্ত্র প্রয়োগ করলেন এবং খাজনা না দেবার মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করে একদল ওয়াহাবি কৃষককে কাছারিতে ধরে এনে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালালেন। এইবার ওয়াহাবিদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিতুমির ও তাঁর অনুগামীরা কৃষ্ণদেব রায়ের বাসস্থান যে গ্রামে ছিল অর্থাৎ পুঁড়াগ্রাম আক্রমণ করেন এবং সেখানে একটি বাজারে গো-হত্যা করে তার রক্ত নিকটবর্তী একটি মন্দিরের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তাছাড়া বিদ্রোহীরা বাজারের বেশিকিছু দোকানও লুণ্ঠন করেন।

১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে বারাসত অঞ্চলের ওয়াহাবি বিদ্রোহ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। পুঁড়ার পর বিদ্রোহীরা লাওঘাট্টি এবং রামচন্দ্রপুর গ্রাম দুটি আক্রমণ করেন। ক্রমে জমিদার বিরোধী এই কৃষক অভ্যুত্থান একটি রাজবিরোধী বৃহত্তর সংগ্রামের চরিত্র ধারণ করতে আরম্ভ করে। স্থানীয় জমিদারেরা এবং রাষ্ট্রশক্তি বিদ্রোহের ব্যাপ্তিতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ১৮৩১ সালের ৭ নভেম্বর রাষ্ট্র জমিদারদের সপক্ষে এবং বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করে। বারাসতের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট কলভিন প্রায় ১২৫ জন সিপাহি ও বরকন্দাজ নিয়ে তিতুমিরের অভ্যুত্থান দমন করার জন্য নারকেলবেড়িয়ায় এসে উপস্থিত হন। সরকারি অভিযান প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ওয়াহাবি বিদ্রোহীরা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন এবং গোলাম মাসুম নামে জনৈক কৃষককে তাঁদের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। বিদ্রোহীরা কলভিনের বাহিনীকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন এবং প্রচুর সিপাহি ও বরকন্দাজকে হত্যা করেন। তারপর বিদ্রোহীরা বসিরহাট থানার দারোগা রামরতন চক্রবর্তীকে হত্যা করেন। এই রামরতন চক্রবর্তীর চক্রান্তেই কৃষ্ণদেব রায় মসজিদ পোড়ানোর অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছিলেন। বিজয়গর্বে উৎফুল্ল বিদ্রোহীরা তারপর ইছামতী নদীর তীরবর্তী নীলকুঠিগুলি একের পর এক ধ্বংস করলেন ও অগ্নিদগ্ধ করলেন। এই অঞ্চলের অধিকাংশ নীলকুঠিরই মালিক ছিলেন ডেভিড অ্যানড্রুইজ নামে এক ইংরেজ। নীলকুঠিগুলির ইংরেজ তত্ত্বাবধায়করা বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন। উইলিয়াম হান্টার বারাসতের বিদ্রোহকে একটি জমিদার-বিরোধী কৃষক-বিদ্রোহ হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। রণজিৎ গুহ লিখেছেন—
এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারি রাজস্ব দপ্তরের, নীলকুঠিগুলির এবং
জমিদারের কাছারিবাড়ির যাবতীয় নথিপত্র ধ্বংস করা। সমসাময়িক *Calcutta Gazette*
লেখা হয়েছিল—তিতুমিরের অনুগামীরা নীলকুঠিগুলির নথিপত্র ধ্বংস করেছিলেন, কারণ
তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া।

কেবলমাত্র যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেটের বাহিনীর প্রতিরোধের মধ্যে বা দারোগা হত্যার মধ্যেই
ওয়াহাবি বিদ্রোহের রাষ্ট্রবিরোধী চরিত্র প্রতিফলিত হয়নি। বিদ্রোহ শুরু হবার কয়েক দিনের
মধ্যেই তিতু ঘোষণা করেছিলেন কোম্পানির সরকারের অবসান আসন্নপ্রায়। বিদ্রোহী দরিদ্র
মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিতু বারাসত অঞ্চলে একটি 'বাঁশের কেল্লা' স্থাপন
করেন। সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে ওয়াহাবিরা তাঁদের 'বাঁশের কেল্লা'য় একটি পতাকা
উড্ডীন করেছিলেন। তিতুমির বাদশাহ উপাধি ধারণ করেন। বিহারীলাল সরকার প্রণীত
তিতুমীর গ্রন্থে উল্লিখিত প্রচলিত এক কাহিনী অনুযায়ী মইনুদ্দিনের বাড়িতে তিতুমিরের
অভিষেক অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছিল। ওয়াহাবি রাজের অধীনে একটি সুশৃঙ্খল
সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। তিতুর প্রধান উপদেষ্টা হন মিসকিন শাহ্ নামে এক
ফকির এবং মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন মৈনুদ্দিন (মতান্তরে মৈজুদ্দিন) নামে এক দরিদ্র জোলা।
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের বলা হত সর্দার। তাঁরা সকলেই এসেছিলেন দরিদ্র কৃষক
পরিবার থেকে। তিতুমির তাঁর নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাসিন্দাদের জমিদারের কাছে খাজনা
দিতে নিষেধ করেন এবং নিজে তাদের কাছ থেকে খাজনা বা 'মালগুজারি' দাবি করেন।
তাছাড়া বিভিন্ন জমিদারের কাছে পরোয়ানা জারি করে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য
দাবি করা হয়েছিল। *সমাচার চন্দ্রিকা* লিখেছিল—যেসব জমিদারেরা ওয়াহাবিদের এই দাবি
অনুযায়ী কাজ করেননি, তাঁরা বিদ্রোহীদের হাতে চরম হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। তবে
সাধারণত ছোটো জমিদারেরা বিদ্রোহীদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন, বড়ো জমিদারেরা
নিরাপত্তার অভাব বোধ করে তাঁদের পরিবারের লোকজনদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন।

ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই তিতুমিরের বিদ্রোহকে দমন করতে উদগ্রীব
হয়ে ওঠে। ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর এক বিশাল ইংরেজ বাহিনী নারকেলবেড়িয়া গ্রাম
আক্রমণ করে এবং যুদ্ধে কামান ব্যবহার করে। বিদ্রোহীদের পক্ষে কামানের বিরুদ্ধে
বেশিক্ষণ যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয়নি। কামানের গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা ছিন্নভিন্ন হয়ে
যায়। তাও বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উন্নতমানের সামরিক
সরঞ্জামের সামনে তাঁদের প্রতিরোধ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। তিতুমির ইংরেজ
বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরের মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রায় আটশো
জন অনুগামীকে বন্দি করা হয়। বন্দিদের বিচার হয়। বিচারে তিতুর সেনাপতি গোলাম
মাসুমের ফাঁসির হুকুম হয়। অন্যান্যদের অধিকাংশকেই দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। চরম নিষ্ঠুরতার
পরিচয় দিয়ে ইংরেজ শাসকেরা বাংলার ওয়াহাবি অভ্যুত্থান দমন করেন।

সমসাময়িক *সমাচার চন্দ্রিকা* ওয়াহাবি বিদ্রোহকে মুসলিম সম্প্রদায়ের হিন্দুবিরোধী
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে দেখেছিল। সাম্প্রতিককালের কিছু গবেষকও উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক

প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়ে তিতুমিরের সংগ্রামের মধ্যে মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির
বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পেয়েছেন। আবার [illegible] ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের
মধ্যে মুসলিম তাঁতি-কৃষকদের শ্রেণিচেতনা আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ
একপেশে। ঐতিহাসিক [illegible] বলেছেন যে
ওয়াহাবি বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল জমিদার বিরোধী ও ইংরেজ সরকার বিরোধী সংগ্রাম।
রণজিৎ গুহ বলেছেন—ওয়াহাবি অভ্যুত্থান ছিল নিম্নবর্গের মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম
এবং উচ্চবর্গের প্রতি [illegible]। ওয়াহাবি বিদ্রোহী [illegible] ও মুসলিম
মধ্যে [illegible]
নিম্নবর্গীয় পরিচিতি (subaltern identity) ঐতিহাসিক [illegible] খুঁজে পেয়েছেন। [illegible]
[illegible]
বিদ্রোহের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অবশ্যই ছিল। [illegible]
প্রমাণ করে যে হিন্দু জমিদারের [illegible]
বিরুদ্ধে [illegible]
তাদের জমিদার ও রাষ্ট্রবিরোধী [illegible] ওয়াহাবি বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা
প্রসঙ্গে ডব্লু. সি. স্মিথ (W. C. Smith) তাঁর *Modern Islam in India : A Social Analysis* গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ মত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"এই বিদ্রোহ ধর্মীয় ছিল, তবে
সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ছিল না। নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা কোথাও নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের
সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। নিম্নবর্গের মুসলমানেরা অর্থনৈতিক বিষয়ের উপেক্ষা করে কোথাও
সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষায় অগ্রণী হয়নি। কৃষক হিসাবে [illegible]
আন্দোলনের মূল [illegible]" (The movement though religious
was not simply communalist. The movement......did not set the lower
class Muslims against lower class Hindus in open conflict, nor did it
divert the lowest class Muslims from economic issues to a false solidarity
with their communal friends but class enemies.) তিতুমিরের জীবনীকার
বিহারীলাল সরকার লিখেছেন যে বহু দরিদ্র হিন্দু তিতুমিরের দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।
আবার বহু মুসলিম ভূস্বামীও ওয়াহাবি বিদ্রোহীদের আক্রমণের শিকার হন। সুতরাং এই
বিদ্রোহ ধর্মকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হলেও ক্রমেই তা সংকীর্ণ ধর্মীয় সীমারেখা অতিক্রম করে
দরিদ্র মানুষের জমিদার ও রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। অধ্যাপক
বিনয়ভূষণ চৌধুরীকে অনুসরণ করে বলা যায়—ওয়াহাবি বিদ্রোহের মধ্যে আদৌ মুসলিম
সাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল না; যে ধর্ম বিদ্রোহীদের প্রভাবিত করেছিল সেই ধর্ম তাঁদের
সংগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। ওয়াহাবি বিদ্রোহ ছিল ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত
এক কৃষক-বিদ্রোহ।

৯.১.২ ফরাজি আন্দোলন

ফরাজিরা ছিল হাজি শরিয়তুল্লা প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠী। পূর্ববঙ্গের ঢাকা,
ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জ জেলাগুলিতে দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ফরাজি

Scanned with CamScanner

ধর্মীয় মতাদর্শ অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শরিয়তুল্লা ফরিদপুর জেলার শিবচর থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে সম্ভবত একটি জোলা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৮ বছর বয়সে হজ করার জন্য মক্কা যান এবং সেখান ওয়াহাবি মতাবলম্বীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮২০ সাল নাগাদ তিনি দেশে ফেরেন এবং ঐস্লামিক আদর্শ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির কথা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে প্রচার করতে থাকেন। ফরাজিদের সম্পর্কে জেমস্ ওয়াইসের (James Wise) আলোচনা থেকে জানা যায় যে কোরান অনুমোদন করেনি এরকম যাবতীয় উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ ফরাজিরা বর্জন করেছিলেন। শরিয়তুল্লা তাঁর অনুগামীদের বেশকিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটিতে বেশ অভিনবত্ব ছিল। এই নির্দেশে বলা হয়েছিল যে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষ যেহেতু 'দার-উল-হারব' বা শত্রুর দেশে পরিণত হয়েছে সেহেতু ফরাজিরা তার প্রতিবাদে শুক্রবার নামাজ পড়বেন না এবং বছরে দুটি ঈদের অনুষ্ঠান পালন করবেন না। তিনি মুসলিমদের হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিতেও নিষেধ করেছিলেন। জনৈক ইংরেজ প্রশাসক জেমস্ টেলর ১৮৪০ সালে তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—"ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ জেলাগুলিতে ফরাজি গোষ্ঠীর প্রভাব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আদৌ সহনশীল নয়। তারা মাঝেমধ্যেই ঢাকা শহরে গোলমাল পাকাচ্ছে। এই কারণে তাদের নেতা শরিয়তুল্লাকে একাধিকবার হাজতে ভরা হয়েছে। সম্প্রতি কৃষকদের খাজনা না দিতে বলার জন্য পুলিশ এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।" শরিয়তুল্লার নির্দেশ এবং টেলরের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্টই ধরা পড়ে যে ফরাজি মতাদর্শ একটি ধর্মীয় গণ্ডির সীমানা অতিক্রম করে একটি রাজনৈতিক রূপ নিতে শুরু করেছিল।

জেমস্ ওয়াইসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ফরাজি মতাদর্শের প্রসার স্থানীয় জমিদারদের আতঙ্কিত করেছিল। ফলে মুসলিম কৃষকদের মধ্যে ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে এই জেলাগুলিতে অধিকাংশ কৃষকই ছিলেন মুসলমান এবং তাঁরা প্রধানত হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের শিকার হতেন। তাছাড়া যে নীল আবাদকারী সাহেবরা কৃষকদের বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করতেন, তাঁদের প্রায় সমস্ত সহযোগী গোমস্তাই ছিলেন হিন্দু। ১৮৫০ সালের ১ জানুয়ারি শরিয়তুল্লার পুত্র দুদু মিঞা, যিনি পিতার মৃত্যুর পর ফরাজি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ইংরেজ সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। এই আবেদনপত্রে মুসলিম মানসিকতার স্বরূপ স্পষ্টভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। দুদু মিঞা লিখেছিলেন—পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন হিন্দু জমিদার মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে দশেরা ও অন্যান্য পূজা উপলক্ষ্যে জোর করে টাকা আদায় করেন, যা মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থি। দুদু মিঞা আরও বলেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত জমিদারই রায়তদের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং রায়তদের ওপর অন্যায্যভাবে জরিমানা ধার্য করেন। জরিমানা দিতে বিলম্ব করলে জমিদারেরা রায়তদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতেন। দুদু মিঞার ভাষ্য থেকে আরও জানা যায় যে 'শুদ্ধ মুসলমানেরা' এই অবৈধ জরিমানা দিতে অস্বীকার করতেন এবং তখন তাঁদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ হত। অকথ্য নির্মম অত্যাচার চালানো ছাড়াও

জমিদারেরা রায়তদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁদের প্রায়ই ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে দিতেন।

বারাসতের ওয়াহাবি আন্দোলনের মতোই ফরাজি আন্দোলনও একটি জমিদার-বিরোধী ও নীলকর-বিরোধী ভঙ্গি চরিত্র ধারণ করেছিল; যদিও ওয়াহাবিদের মতোই তিতুমীরের সূত্রপাত হয়েছিল ধর্মীয় বিরোধকে কেন্দ্র করে। ফরাজিরাও একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাই শরিয়তুল্লা তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—এই বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো আচার বা প্রথা তাঁরা যেন মেনে না নেন। অথচ আমরা দেখেছি হিন্দু জমিদাররা প্রায়ই হিন্দু পূজাপার্বণের জন্য মুসলমান রায়তদের থেকে আবওয়াব আদায় করতেন। ফরাজিরা এই ধরনের আবওয়াব দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে মূর্তিপূজার জন্য টাকা দেবার অর্থ তাঁদের ঈশ্বরের অখণ্ডতার বিশ্বাসকে আঘাত করা। ঐতিহাসিক বিনয়ভূষণ চৌধুরী যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন—"ফরাজীদের এ প্রতিবাদের তাৎপর্য শুধুমাত্র জমিদারের আর্থিক ক্ষতি নয়; এটা আসলে জমিদারি এলাকায় তাদের দীর্ঘদিনের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের উপর আঘাত।" প্রকৃতপক্ষে জমিদার, নীলকর প্রভৃতি শক্তিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ফরাজিদের সংঘর্ষে যাওয়ার কতকগুলি কারণ ছিল। এই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন—ফরাজিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারি শোষণ ব্যবস্থা ও নীলচাষ প্রথার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো। এ প্রসঙ্গে দুদু মিঞার একটি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। দুদু মিঞা বলতেন—"জমি ভগবানের দান; এতে জমিদারের ব্যক্তিগত মালিকানা ভগবৎ বিধান বিরোধী।" সমসাময়িক সরকারি নথিপত্রেও ফরাজিদের এই 'বিশেষ প্রিয় বিশ্বাসের' উল্লেখ রয়েছে। এই বিশ্বাস থেকেই দরিদ্র ফরাজি কৃষকেরা যে-কোনো ধরনের খাজনা দিতে অপছন্দ করতেন এবং সেই সুদিনের স্বপ্ন দেখতেন যেদিন তাঁদের কোনোরকম খাজনা দেবার দায় থাকবে না।

১৮৩৮ সালে দুদু মিঞা তাঁর অনুগামী কৃষকদের জমিদারি খাজনা দিতে নিষেধ করেন এবং নীলকর সাহেবদের কথামতো নীলচাষ করতে বাধ্য না হবার নির্দেশ দেন। তখন থেকেই ফরাজি বিদ্রোহীরা ফরিদপুর অঞ্চলের নীলকুঠিগুলি আক্রমণ করে ধ্বংস করতে শুরু করেন। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ নীলকুঠিরই মালিক ছিলেন ডানলপ নামে এক ইংরেজ। মুইনুদ্দিন আহম্মদ খাঁ তাঁর *History of the Faraiji Movement in Bengal* গ্রন্থে বলেছেন হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয়-নির্বাহের জন্য ফরাজিদের ওপর যে আবওয়াব ধার্য করা হত, তার বিরুদ্ধে ফরাজিদের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। এছাড়াও মুইনুদ্দিন আহম্মদ খাঁ তাঁর গ্রন্থে জমিদারি নির্যাতন ও উৎপীড়নের নানা কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮৩৯ সালের ৭ এপ্রিল ফরিদপুরের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন—শিবচুর থানায় প্রায় সাত-আট হাজার লোকের একটি জমায়েত হয়েছে। যোগদানকারীদের অধিকাংশই হাজি মুসলমান সম্প্রদায় এবং দরিদ্র রায়ত শ্রেণীর লোক। যশোর ও বাখরগঞ্জের হাজিরাও এই সমাবেশে যোগ দেন। এই সমাবেশেই ফরাজিরা দুদু মিঞাকে তাঁদের নেতা নির্বাচন করেন। সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সমাবেশে যোগদানকারী ফরাজিরা পুলিশের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন এবং শিবচুর থানার দারোগাকে ভয় দেখিয়েছিলেন। দুদু মিঞার আন্দোলনের অন্যতম অভিনব বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে—ফরাজিরা নিজস্ব আইন

Scanned with CamScanner

প্রণয়ন করেছিলেন এবং তাঁদের নিজেদের আদালত ছিল। তাঁরা সরকারি আদালতগুলিকে বর্জন করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফরাজি আদালতগুলির বিচারকদের বলা হত মুন্সি। এক-একজন মুন্সির এক্তিয়ারে দু-তিনটি গ্রাম থাকত। মুন্সি ফরাজিদের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করতেন। ঐতিহাসিক শশীভূষণ চৌধুরী তাঁর *Civil Disturbances during British rule in India* গ্রন্থে বলেছেন ফরাজিদের আদালতগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কারণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরাই মনে করেছিলেন যে এই আদালতগুলি তাঁদের জমিদারি উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করবে।

দুদু মিঞা এবং তাঁর অনুগামীরা ফরাজি ধর্মীয় মতাদর্শের বিরোধীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোকে, এমনকি তাদের হত্যা করাকেও কোনো 'পাপ' বলে মনে করতেন না। ফরাজিদের যে বিচার হয়েছিল, সেই বিচার-সংক্রান্ত নথিপত্র প্রমাণ করে, যেসব মানুষ জমিদারদের আশ্রয় গ্রহণ করত তাদের বা অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ফরাজিরা সাধ্যানুযায়ী আঘাত করতে কুণ্ঠিত হতেন না। দুদু মিঞার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ফরাজি রাজ কায়েম করা হয়েছিল। দুদু মিঞা কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মকানুন চালু করেছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গকে কতকগুলি বিভাগে (circle) বিভক্ত করেন। প্রতিটি বিভাগে তিনি একজন করে খলিফা নিযুক্ত করেন। খলিফারা নিজ নিজ এলাকার খবরাখবর সংগ্রহ করে দুদু মিঞাকে জানাতেন। অনুগামীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই অর্থকে বলা হত ফরাজি কর। ফরাজি কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরকারি আদালতে দরিদ্র কৃষকদের হয়ে মামলা লড়ার এবং ফরাজি আন্দোলন চালানোর ব্যয়-নির্বাহ করা হত।

নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে ফরাজিদের আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছিল। ফরিদপুর অঞ্চলের অধিকাংশ নীলকুঠির মালিক ডানলপ ফরাজিদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের সাহায্য নিয়ে দুদু মিঞার বাড়ি লুণ্ঠন করেন ও ধ্বংস করেন। দুদু মিঞা প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে ডানলপের মালিকানাধীন একটি নীলকুঠি অগ্নিদগ্ধ করেন ও সেই নীলকুঠির গোমস্তা কালি কাঞ্জিলালকে হত্যা করেন। এই অপরাধে দুদু মিঞাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে। সরকারি তদন্ত স্পষ্টই প্রতিপন্ন করেছিল যে দুদু মিঞা ডানলপের যতটা ক্ষতি করেছিলেন তার থেকে ডানলপ দুদু মিঞার অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করেছিলেন। বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে দুদু মিঞা বলেছিলেন যে নীলকর সাহেবরা তাঁর সম্পত্তি, বাড়ি, জমি, তালুক এবং জীবন ধ্বংস করেছে। যে বিচারক দুদু মিঞার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার করেছিলেন, তিনি বিচারের রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলেন—"নীল আবাদকারীরা ধারাবাহিকভাবে রায়তদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। তাদের ব্যবস্থায় পার্থিব কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের বা স্বর্গীয় কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। সাধারণ বিচার বলে কিছুই নেই। ডানলপের নীলকুঠির ধ্বংসসাধন সাধারণ বিচারকে অগ্রাহ্য করারই পরিণতি" (The land of the planter systematically lifted up against the life and property of a raiyat; a system that appeared to me neither the existence

of a magistrate on earth, nor a God in heaven. I found a total absence of ordianary justice.....The outrage on Mr. Dunlop's factory originated in the total denial of ordinary justice.)। তদন্তকারী সরকারি কর্তৃপক্ষ দুদু মিঞার বিরুদ্ধে 'বেআইনি কার্যকলাপ' (lawless conduct) এবং বিপজ্জনক মতবাদ (dangerous doctrine) প্রচারের অভিযোগ এনেছিলেন। শেষপর্যন্ত বিচারে ১৮৬৯ সালে দুদু মিঞার ওপর জরিমানা ধার্য করা হয় এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।

উনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাসে দুদু মিঞা একটি উল্লেখযোগ্য নাম। প্রায় পাঁচিশ বছর ধরে তিনি পূর্ববঙ্গের এক বিতর্কিত চরিত্র হিসাবে প্রতিভাত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার ঘরে ঘরে দুদু মিঞার নাম উচ্চারিত হত। ফরাজিরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রাথমিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁরা কিছুটা সফলতাও লাভ করেছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত তাঁরা কোম্পানি সরকার, নীলকর সাহেব, জমিদার-মহাজনের সম্মিলিত শক্তিজোটের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। ফরিদপুরের বৃদ্ধ-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রতিবেদনে দুদু মিঞার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছিলেন—"দুদু মিঞা নীতিজ্ঞানহীন জমিদারদের মতো পেছনে বসে কলকাঠি নাড়তেন না। তাঁর অনুগামীরা যখন লুণ্ঠন চালানোর কর্মসূচি নিতেন, তখন তিনি অগ্রভাগে থেকে তাঁদের নেতৃত্ব দিতেন" (All who have any experience of the Farajis must be well aware that unlike unprincipled zamindars who generally keep themselves in background, Dudu Miyan always was either present or close at hand during all the principal acts of plunder committed by his followers.)।

১৮৬২ সালে দুদু মিঞা ঢাকায় দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও ফরাজি আন্দোলন চলেছিল। ফরাজি কার্যকলাপের পুরোনো কেন্দ্রগুলিতে ফরাজিরা বিক্ষিপ্তভাবে তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন—"দুদু মিঞার মৃত্যুর পর.....দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে দুদু মিঞা ও তাঁদের ফরাজি মতবাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।" কিন্তু শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। আন্দোলনের নেতাদের অস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে অবচ্ছ ধারণা সংগ্রামকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাছাড়া ফরাজিরা দুদু মিঞার বিকল্প কোনো যোগ্য নেতা গড়ে তুলতে পারেননি। দুদু মিঞার একক নেতৃত্বে পরিচালিত এই গণসংগ্রাম দুদু মিঞার দীর্ঘ কারাবাসের ফলে বারবার নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। এই নেতৃত্বহীন বিদ্রোহীদের দমন করা ইংরেজ সরকার, নীলকর সাহেব ও জমিদারদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। তবে নেতা মিঞার নেতৃত্বে ফরাজিরা ১৮৮০-র দশক পর্যন্ত ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও মালদহে জমিদার-বিরোধী কৃষক-বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

নরহরি কবিরাজ লিখেছেন—ফরাজিদের শক্তির প্রধান উৎস ছিল ধর্মীয় ঐক্য। একটি বিশেষ মুসলিম গোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনা ক্রমে দরিদ্র কৃষকদের প্রভাবিত করেছিল এবং ধর্মভিত্তিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ফরাজিরা মনে করতেন সরকারকে কর দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু জমিদারকে

Scanned with CamScanner

খাজনা দেওয়া যাবে না। তাই তাঁরা সরকারি খাসমহাল ও চর এলাকাগুলিতে জমিচাষ করতে পছন্দ করতেন। ঢাকার নিভাগীয় কমিশনার ডানলার বলেছিলেন—ফরাজিরা এলাকার আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করছে। তাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ফরাজিদের দমন করার জন্য তিনি সরকারি হস্তক্ষেপ সুপারিশ করেন। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ফরাজি আন্দোলনকে দমন করেছিল, কিন্তু ভারতের গণসংগ্রামের ইতিহাসে ফরাজি বিদ্রোহ একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

৯.১.৩ সাঁওতাল অভ্যুত্থান

সাম্প্রতিককালের জনৈক গবেষক কে. সুরেশ সিং মন্তব্য করেছেন—ভারতীয় কৃষক সহ অন্যান্য যে-কোনো গোষ্ঠীর থেকে অনেক বেশি জঙ্গি ও হিংস্র বিদ্রোহে শামিল হয়েছিলেন ভারতের উপজাতিরা। ব্রিটিশ-বিরোধী গণসংগ্রামে উপজাতিদের একটি গৌরবময় ভূমিকা ছিল। এই উপজাতি বিদ্রোহগুলির মধ্যে ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল উপজাতীয় সামাজিক সংহতি এবং বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদে আঞ্চলিকতার চেতনার সংগ্রামী বহিঃপ্রকাশ। অন্যান্য উপজাতিদের মতোই সাঁওতালরাও ছিলেন ভারতীয় সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিজেদের শ্রম ও প্রচেষ্টায় সাঁওতালরা সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলকে বাসযোগ্য ও উর্বর করে তুলেছিলেন। এই অঞ্চলকে বলা হত দামিন-ই-কোহ্। কিন্তু অচিরেই বহিরাগতরা এই অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে সাঁওতালরা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হন। বহিরাগতদের সাঁওতালরা বলতেন 'দিখু' বা বিদেশি। 'দিখু'দের মধ্যে ইংরেজরা এবং ভারতীয় বণিক ও মহাজনেরা পড়তেন। ইংরেজরা দামিন-ই-কোহ্-র জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয় মহাজনরা সাঁওতালদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাঁদের টাকা ঋণ দিতেন এবং অসদুপায় অবলম্বন করে তাঁদের জমিজমা দখল করে নিতেন। উভয়ের কার্যকলাপই সাঁওতালদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত করেছিল। ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত তাঁর *The Santal Insurrection of 1855-57* গ্রন্থে দেখিয়েছেন—মহাজনরা সাঁওতালদের সামান্য পরিমাণ টাকা ও কিছু চাল ধার হিসাবে দিতেন। তারপর তাঁরা ধূর্ত ও উৎপীড়নমূলক পন্থা অবলম্বন করে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দরিদ্র সাঁওতালদের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে বসতেন। অধমর্ণ সাঁওতালদের মহাজনেরা তারপর সারাজীবন ধরে নিয়ন্ত্রণ করতেন। ব্র্যাডলে-বার্ট (Bradley-Birt) তাঁর *Story of an Indian Upland* গ্রন্থে বলেছেন সাঁওতালদের মহাজনেরা 'ক্রীতদাসের স্তরে' (condition of slavery) নামিয়ে এনেছিলেন এবং মহাজনী শোষণ সরকারি আদালতগুলির পূর্ণ সমর্থন ও অনুমোদন পেয়েছিল। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস* গ্রন্থে বলেছেন—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান থেকে মহাজনদের সঙ্গে প্রচুর বাঙালি ব্যবসায়ীও এসেছিলেন। তাঁরা সাঁওতালদের কাছ থেকে সস্তাদরে ফসল কিনে চড়াদামে বাইরে চালান দিতেন আর বাইরে থেকে নুন, তেল প্রভৃতি

Scanned with CamScanner

দশম অধ্যায়

মহাবিদ্রোহ—১৮৫৭

পলাশির যুদ্ধের পরবর্তীকালীন ১০০ বছরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ অন্তত ৫০ বার অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল, যেগুলির মধ্যে অনেক সময় সিপাহিরাও শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু এগুলি ছিল মূলত অসংগঠিত ব্রিটিশ-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন এবং এই উত্থানগুলির মধ্যে সংকীর্ণ আঞ্চলিক গণ্ডির সীমারেখা ভেদ করে অভ্যুত্থানকে জাতীয় স্তরে নিয়ে আসার প্রয়াস বা পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতের গণবিদ্রোহের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালেই প্রথম আঞ্চলিক গণ্ডির সীমারেখা ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ইংরেজ সরকারের অধীনে কর্মরত সিপাহিদের ব্যক্তিগত প্রতিবাদগুলি ৯ মে পাঞ্জাবের আম্বালা অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছিল। ৬০ নম্বর ও ৫ নম্বর দেশীয় পদাতিক বাহিনীর ভারতীয় সিপাহিরা ঐ অঞ্চলে কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ১০ মে ২০ নম্বর ও ১১ নম্বর পদাতিক বাহিনীর সিপাহিরা ৩ নম্বর অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে বিদ্রোহে যোগ দেয়। ১১ মে সিপাহিরা দিল্লি দখল করে মোগল বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। জুন মাসে মাঝামাঝি সময়ে সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারত বিদ্রোহের পদধ্বনিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং বিদ্রোহীরা বৃদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে কেন্দ্র করে এক ব্যাপক ও তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

১৮৫৭ সালের এই মহাবিদ্রোহ নিয়ে অজস্র ঐতিহাসিক আলোচনা হয়েছে। সমসাময়িক ইংরেজ আমলা থেকে শুরু করে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা, পরবর্তীকালে ইংরেজ এবং ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মহাবিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই এই মহাবিদ্রোহকে একটি অসংগঠিত সিপাহি বিদ্রোহ বা তুচ্ছ সামরিক অভ্যুত্থান হিসাবে দেখেছেন। অনেকের মতে এই মহাবিদ্রোহে ভারতের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তপ্রভুদের শেষ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। অনেকের মতে ১৮৫৭-র এই মহাবিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। অনেকে আবার এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে গণবিদ্রোহের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচনা করলে তার প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টভাবে বোঝা যেতে পারে।

১০.১ মহাবিদ্রোহের কারণ

১৮৫৭ সালের ১১ মে দিল্লির পতন এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা ভারতের বিভিন্ন স্থানের সিপাহি ও জনসাধারণকে ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহের ব্যাপারে

উৎসাহিত করে তুলেছিল। দিল্লির পতনের গুরুত্ব অনুধাবন করে হেনরি লরেন্স ১৮৫৭ সালের ২১ মে এডমনস্টোনকে লিখেছিলেন—দ্রুত দিল্লি দখল করতে না পারলে শান্তি খুব বেশিদিন বজায় রাখা যাবে না (Tranquility cannot be much longer maintained unless Delhi be speedily captured.)। একথার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত ছিল। জুন মাসের গোড়াতেই সিপাহিদের বিদ্রোহ ভারতের নানাস্থানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। কায়ে (Kaye) নামে এক পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী লিখেছিলেন—সাধারণ নাগরিকেরাও কোম্পানি রাজকে উচ্ছেদ করার জন্য এই বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেরকম বিদ্যুৎগতিতে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তার থেকে একথা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে এই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে একটা সংগঠিত প্রয়াস ছিল। বিদ্রোহের আগে সিপাহিদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে লাল পদ্মফুল এবং 'চাপাটি' (রুটি) পাঠানো হয়েছিল। এই ঘটনা আশু অভ্যুত্থানের সংকেত বহন করেছিল। টি. মেটকাফ (T. Metcalfe) লিখেছেন—চাপাটি বিতরণের ঘটনা ছিল ১৮০৩ সালে মারাঠাদের উত্তর ভারত আক্রমণের আগের ঘটনার অবিকল পুনরাবৃত্তি। শুধু তফাত ছিল একটাই। মারাঠারা চাপাটির সঙ্গে মাংস পাঠিয়েছিলেন, সিপাহিরা চাপাটির সঙ্গে পাঠান ছুরি। সাঁওতাল বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে বিদ্রোহ শুরু করার প্রাক্‌পর্বে সাঁওতালরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে শালগাছের ডাল বিতরণ করেছিলেন। মেটকাফ আরও বলেছেন—কোনো ইউরোপীয়র বাড়ি অথবা সরকারি টেলিগ্রাফ অফিস অগ্নিদগ্ধ করার ঘটনাবলিও বিদ্রোহের সংকেত হিসাবে কাজ করেছিল। যাঁরা গোপন তথ্য রাখতেন, তাঁরা অভ্যুত্থানে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে এই সংকেতগুলির মাধ্যমে অবহিত হতেন। যদিও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বারবার জোরের সঙ্গে বলেছেন যে বিদ্রোহের পেছনে কোনো সংগঠিত পরিকল্পনা ছিল না, তবুও তিনি এক্ষেত্রে অন্তত স্বীকার করেছেন যে সিপাহিদের নিজেদের মধ্যে আগে থেকে একটা "আলাপ-আলোচনা এবং সমঝোতা" হয়েছিল। এক রেজিমেন্টের সিপাহিরা অন্য রেজিমেন্টের সিপাহিদের কাছে কতকগুলি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেইসব চিঠির বয়ান উদ্ধৃত করে কায়ে দেখিয়েছেন যে চিঠিগুলোর মাধ্যমে সিপাহিদের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্দীপ্ত করা হয়েছিল এবং যারা বিদ্রোহে যোগ দেবে না তাদের সামাজিকভাবে নির্বাসিত করার ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল। যদিও বিদ্রোহের সূচনাকারী সুবিন্যস্ত সংগঠনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, তা সত্ত্বেও ঘটনাপরম্পরা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে বিদ্রোহের ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

রুদ্রাংশ মুখার্জি তাঁর *Awadh in Revolt : 1857-58* নামে সাম্প্রতিক গ্রন্থে বলেছেন—গুজব, ভীতি এবং আতঙ্ক সিপাহিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং সহিংস অভ্যুত্থানের পথ গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিল। এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা আছে। তবে বহুকাল ধরে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সিপাহিদের মধ্যে এই ধরনের মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ৩০ জুন চিনহাটের যুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ্ণৌ অঞ্চল বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। বিদ্রোহীরা বির্জিস কাদেরকে লক্ষ্ণৌ-এর রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। রাজা হয়েই বির্জিস কাদের একটি 'রাজকীয় ঘোষণাপত্র' (Royal Proclamation) জারি করেন। উক্ত ঘোষণাপত্রে

Scanned with CamScanner

বিদ্রোহের কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল—একটি বিদেশি সরকারের অধীনে ভারতীয়দের ধর্ম, মর্যাদা, জীবন ও সম্পত্তি সংক্রান্ত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ১৮৫৭ সালের ২৫ আগস্ট সম্রাট বাহাদুর শাহ্ 'আজমগড় ঘোষণাপত্র' নামে আর একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন। এই ঘোষণাপত্রে ভারতীয়দের তীব্র অসন্তোষের পেছনে ধর্মীয় কারণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল—ইংরেজ শাসকদের কতকগুলি কু-মতলব রয়েছে। তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সমস্ত সিপাহিদের ধর্ম ধ্বংস করা এবং তারপর হিন্দুস্থানের যাবতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। আমরা ধর্মের ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছি, একজন বিধর্মীকেও জীবিত রাখিনি এবং এইসব শর্তের ওপর নির্ভর করেই দিল্লির রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রে আসলে সিপাহিদের বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছিল, যাঁরা মনে করেছিলেন একমাত্র ইংরেজ শাসনকে ধ্বংস করতে পারলেই তাঁরা খ্রিস্টধর্মে ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত হবার আশঙ্কা ও বিপদ থেকে মুক্ত হবেন। ১৮৫৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি অযোধ্যার যুবরাজ ফিরোজ শাহ্-র জারি করা ঘোষণাপত্রেও ইংরেজ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করার সক্রিয় প্রয়াসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। জনৈক ইংরেজ পদস্থ কর্মচারী সি. বল (C. Ball)-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার প্রাকমুহূর্তেও একাধিক বিদ্রোহী তাঁদের জবানবন্দিতে বলেছিলেন—আমাদের ধর্মরক্ষার তাগিদেই ইংরেজদের কোতল করার প্রয়োজন পড়েছিল (The slaughter of the English was required by our religion.)। ৩৪ নম্বর দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সিপাহিদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে তারা অচিরেই খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হবে। ১৮৫৭ সালের ১০ জুনের *দি টাইমস্* (The Times) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে—গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং লর্ড পামারস্টোনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সমস্ত ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত হবার ব্যাপারে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন। সিপাহি এবং সাধারণ নাগরিকদের ধর্মান্তরিত হবার ব্যাপারে ভীতি ও সন্দেহ মোটেই অযৌক্তিক বা অন্যায্য ছিল না। কোম্পানির কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্-এর চেয়ারম্যান ম্যাঙ্গেলস্ (Mangles) ১৮৫৭ সালে হাউস অফ্ কমন্সে রাখা একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন—সমগ্র ভারতে খ্রিস্টের পতাকা উড্ডীন রাখতে হবে এবং ভারতকে একটি খ্রিস্টান দেশে পরিণত করার জন্য সকলকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ যথেষ্ট আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল এবং কোম্পানির সরকার তাদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল। মিশনারিরা নিজেদের ধর্মপ্রচার ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ধর্মমতগুলিকে আপত্তিজনক ভাষায় আক্রমণ করত। ১৮৫০ সালে প্রণীত ২১ নম্বর আইনে বলা হয়েছিল যে—এখন থেকে কোনো ভারতীয় ধর্মান্তরিত হলেও সে তার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। এই আইন ভারতীয়দের মোটেই খুশি করতে পারেনি। সৈয়দ আহ্মেদ খান বলেছিলেন—আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয়কে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই আইন প্রণীত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ৯ মে হেনরি লরেন্স গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে লেখা একটি চিঠিতে অযোধ্যা গোলন্দাজ বাহিনীর জনৈক জমাদারের ধর্মান্তরিত হবার অভিজ্ঞতার

কথা বিবৃত করেছিলেন। সেই জমাদার নাকি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে গত দশ বছর ধরে সরকার সমস্ত ভারতীয়কে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত। এই ধারণা সিপাহিদের মধ্যে এতটাই বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে সীতাপুরে বিদ্রোহ শুরু হবার আগের দিন সেখানকার সিপাহিরা তাদের জন্য বরাদ্দ আটা স্পর্শ করতে অস্বীকার করেছিল, কারণ তারা মনে করেছিল যে এই আটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র করা হয়েছে, যা গ্রহণ করলে তাদের জাত যাবে। সাধারণত বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়ে গেছে। কায়ে এবং অন্যান্য অনেকেই বলেছিলেন যে এনফিল্ড রাইফেলে এক বিশেষ ধরনের কার্তুজ ব্যবহৃত হত যার টোটা শুয়োর অথবা ষাঁড়ের মাংস দিয়ে তৈরি। প্রধান সেনানায়ক অ্যানসন (Anson) ১৮৫৭ সালের ২৩ মার্চ ক্যানিংকে লিখিত একটি চিঠিতে এই টোটার ব্যাপারে সিপাহিদের ক্ষোভের কথা স্বীকার করেছিলেন। ম্যালেসন লিখেছিলেন—কার্তুজের বিষয়টি ছিল একটি ঘটনামাত্র, যা বারুদে অগ্নিসংযোগ করেছিল। সি. বল অবশ্য কার্তুজের বিষয়টিকে বিদ্রোহের আসল কারণ হিসাবে মনে করেননি। তাঁর মতে এই কার্তুজ বিদ্রোহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছিল। বাহাদুর শাহের বিচারের সময় সরকারি উকিলও বলেছিলেন—দিল্লি ও মিরাটে ইংরেজদের হত্যা করার সময় বিদ্রোহীরা এই কার্তুজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছিল। এইসব ইংরেজদের বক্তব্যের সারকথা এই যে কার্তুজ ব্যবহারে যদি সিপাহিদের ধর্ম নষ্টই হবে তবে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধেই বা সেগুলির সাহায্য নেবে কেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যখন সাম্রাজ্যবাদী শাসক বনাম শৃঙ্খলিত শাসিতের মধ্যে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল তখন শাসিতদের পক্ষে এত বাছবিচার করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কোনো ইংরেজ পদাধিকারীই একটি বিষয় অস্বীকার করেননি যে এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের টোটা মুখ দিয়ে খুলতে হত। তাছাড়া প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে ভারতীয়দের কাছে ধর্মীয় কারণে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কিছু উপাদান দিয়েই ঐ টোটা তৈরি হত। সুতরাং এনফিল্ড রাইফেল যে ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছিল সন্দেহ নেই। ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানে ধর্মীয় কারণের গুরুত্বকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক জুডিথ ব্রাউন (Judith Brown) তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ *Modern India : The Origins of an Asian Democracy*-তে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধর্মীয় কারণের ওপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করেননি। সিপাহি তথা জনসাধারণের ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষোভ ও অসন্তোষের বিষয়ে প্রচুর তথ্য ও প্রমাণের অস্তিত্ব সত্ত্বেও জুডিথ ব্রাউন কিছুটা আশ্চর্যজনকভাবেই মন্তব্য করেছেন—ভারতীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আক্রমণ সংক্রান্ত ভীতি যে অসন্তোষের গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিদ্রোহের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সিপাহিদের স্বল্প বেতন এবং তাদের পদোন্নতির সুযোগের অভাব। একটি পরিসংখ্যান থেকেই ভারতীয় সিপাহিদের স্বল্প বেতনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতে নিযুক্ত কোম্পানির সৈন্যদের মধ্যে মাত্র ১৬.২ শতাংশ ছিল ইউরোপীয়। অথচ তাদের পেছনেই কোম্পানি সৈন্যদের দেওয়া সমগ্র বেতনের ৫৭.৮

Scanned with CamScanner

শতাংশ পায় করত। বেতনের এই বৈষম্য স্বাভাবিকভাবেই সিপাহিদের ক্ষুব্ধ করেছিল। কায়ো তাঁর বিবরণে ভারতীয় সিপাহিদের পদোন্নতির সুযোগ সংকোচনের উল্লেখ করেছেন। সিতারাম পাণ্ডের লেখা থেকে জানা যায় যে একজন ভারতীয় সিপাহি পদোন্নতির সুবাদার পদ পর্যন্ত উন্নীত হতে পারতেন, আর এই পদের স্থান ছিল সদ্যনিযুক্ত ইউরোপীয় অফিসারদের অনেক নীচে। কেবলমাত্র সামরিক বিভাগেই নয়, সমস্ত সরকারি উচ্চপদই প্রায় ভারতীয়দের জন্য বন্ধ ছিল। স্যর সৈয়দ আহমেদ খান লিখেছিলেন—অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সরকারি উচ্চপদ প্রাপ্তি থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করার ব্রিটিশ নীতি বিদ্রোহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তাছাড়া সিপাহিরা প্রায়ই ইংরেজদের দুর্ব্যবহারের শিকার হত। ইংরেজরা তাদের অকথ্য গালিগালাজ করত এবং অপমান করত। শুধু সিপাহিরা কেন, সমস্ত ভারতীয়দের ওপরই ইংরেজদের জাত্যাভিমানজনিত রোষ ও অসম্মান বর্ষিত হত। এমনকি অভিজাতশ্রেণীর মানুষেরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ন্যূনতম মর্যাদা এদের প্রতিও ইংরেজ শাসকেরা প্রদর্শন করেনি। ফলে সাধারণ সিপাহি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেরই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। একাধিক সমসাময়িক বিদেশি, যথা—লন্ডন টাইমস্ পত্রিকার সাংবাদিক রাসেল অথবা স্কটিশ মিশনারি রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখ সকলেই তাঁদের বিবরণে স্পষ্টই বলেছেন, ব্রিটিশরাজের প্রতি ভারতীয়দের আনুগত্যের লেশমাত্র ছিল না। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতীয়দের ব্রিটিশ-বিরোধী ক্রোধের বিস্ফোরণের পথ উন্মুক্ত করেছিল এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই ব্রিটিশ-বিরোধী মহা-অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল।

লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদী নীতির নগ্ন প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল তাঁর স্বত্ববিলোপ নীতির মধ্যে। এই নীতির সাহায্যে ডালহৌসি একের পর এক দেশীয় রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে দেশীয় রাজন্যবর্গের কোপানলে পড়েছিলেন। বঞ্চিত ও নিতাড়িত রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাপটে নিজেদের অসহায় মনে করতে শুরু করেছিলেন এবং নিজেদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির তাগিদে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কামনা করেছিলেন। স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবে সাতারা, ঝাঁসি, তাঞ্জোর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে ডালহৌসি চূড়ান্ত নীতিহীনতার পরিচয় দিয়ে নাগপুর দখল করেন। ১৮৫৪ সালে কর্ণাটকের নবাব পদ অবলুপ্ত হয়। পেশবা দ্বিতীয় বাজিরাও-এর দত্তকপুত্র নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সবচেয়ে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল কোম্পানি কর্তৃক অযোধ্যা দখল। ১৮৫৬ সালে ডালহৌসি অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অযোধ্যা দখলের সময় যে বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ 'বেঙ্গল আর্মি'র অধিকাংশ সৈনাই নিয়োগ করা হয়েছিল অযোধ্যার গ্রামাঞ্চল থেকে। তারা স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের অযোধ্যা দখল ভালোচোখে দেখেনি। তার ওপর অযোধ্যায় একটি অত্যন্ত কঠোর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন সিপাহি তথা সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করেছিল। বেগম হজরত মহলের ঘোষণাপত্রে আক্ষেপের সুরে বলা হয়েছিল—সন্ধিচুক্তির সমস্ত শর্ত লঙ্ঘন করে এবং নিজেদের কথার খেলাপ করে ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করে নিয়েছে। ইংরেজদের অযোধ্যা দখল থেকে বিদ্রোহের সূচনাপর্ব পর্যন্ত অযোধ্যা অঞ্চলের

৭৫,০০০ সিপাহি প্রদেশের পীড়নমূলক রাজস্বনীতির বিরুদ্ধে অন্তত ১৪,০০০টি আবেদন (petition) দাখিল করেছিল। ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে দেশীয় নৃপতিদের মর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এজন্য অসন্তুষ্ট দেশীয় রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ইংরেজ সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ফলে জনসাধারণের অসন্তোষ এবং ক্ষোভ। ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে ভারতীয়দের জীবনে চরম দারিদ্র্য নেমে এসেছিল। সেজন্য, দরিদ্র ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে এই বিদ্রোহী মহাবিদ্রোহে শামিল হয়েছিল। ভারতীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করেছিল কোম্পানির সরকারের ভূমিরাজস্ব নীতি। চিরস্থায়ী, রায়তওয়ারি বা মহালওয়ারি—বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহীত সমস্ত ভূমিব্যবস্থারই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তা হল—কৃষকদের ওপর খাজনার মারাত্মক বোঝা। খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকেরা সরকার বা জমিদারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে মহাজনদের কাছ থেকে চড়াসুদে ঋণ নিতে বাধ্য হত। এই ঋণের বোঝা তাদের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলেছিল। একদিকে মহাজনী শোষণ, অন্যদিকে জমিদারের শোষণ বা সরকারি কর্মচারীদের অত্যাচার কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তার ওপর উত্তর ভারতের ভূমিব্যবস্থার ফলে সেখানকার রায়তেরা জমির ওপর তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার হারিয়েছিল। উত্তর ভারতে কর্মরত জনৈক জেলা শাসক মার্ক থর্নহিল (Mark Thornhill) এই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে 'নিষ্ঠুর' (cruel) বলে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে স্বীকার করা হয়েছিল যে ১৮৩৮ সালে এডওয়ার্ড থর্নটনের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত জমিদার ও কৃষকদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল এবং কৃষির অবনতি ঘটিয়েছিল। ভূমিরাজস্ব দিতে ব্যর্থ কৃষকদের জমি নিলামে বিক্রির নিয়ম চালু করে মহাজনদের প্রভাব বৃদ্ধি করা হয়েছিল, কারণ জমি রক্ষা করার তাগিদে রায়তেরা যে-কোনো শর্তে মহাজনদের শরণাপন্ন হতেন। মহাজন ও বেনিয়ারা—এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জমির মালিক হয়ে বসতেন। ঐতিহাসিক শশীভূষণ চৌধুরী বলেছেন—মহাজনেরা প্রায়ই অজ্ঞ কৃষকদের প্রতারিত করত এবং এ বিষয়ে তারা পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য পেত ইংরেজ সরকারের আদালতগুলির কাছ থেকে। ব্রিটিশ আদালতগুলির মহাজনদের রক্ষা করার নীতি কৃষক ও দরিদ্রতর ক্ষেতমজুরদের, যাদের মহাজনদের থেকে ঋণ না নিয়ে উপায় ছিল না, অসন্তুষ্ট ক্ষুব্ধ করেছিল। এই কারণেই কৃষকেরা ও দরিদ্রতর শ্রেণীর ক্ষেতমজুরেরা বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে আপসহীন ও প্রতিশোধপ্রবণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অধ্যাপক চৌধুরী তাই মনে করেন—সাধারণ ভারতবাসীর জমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত স্বার্থ ও অধিকার লঙ্ঘিত হবার প্রশ্নেই তারা বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করেছিল এবং অন্যান্য কারণের থেকে অর্থনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবার বিষয়টি ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪৬ সালে আলিগড়ের কালেক্টর জি. ব্লান্ট (G. Blaunt) একটি প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—অতিরিক্ত রাজস্বের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হয়ে আলিগড়, মৈনপুরী, মথুরা ও বান্দা জেলার গ্রামীণ সংস্থা (village community) গুলি প্রচুর জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। ঐতিহাসিক এরিক স্টোকস (Eric Stokes)

Scanned with CamScanner

বলেছেন—যমুনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় এবং গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী রাজপুতেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, কারণ তারা সেখানকার নিষ্ঠুর ও দমনমূলক ভূমিব্যবস্থা মেনে নিতে পারেনি। স্টোকস আরও বলেছেন—পশুচারণের জন্য রক্ষিত বংশানুক্রমিক জমিগুলি হাতছাড়া হবার ফলে হরিয়ানা ও উচ্চ দোয়াব অঞ্চলের পশুচারণকারী গুজরেরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। রুদ্রাংশু মুখার্জী বলেছেন—১৮৫৬ সালে অযোধ্যা দখল করার পর ইংরেজরা সেখানে যে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত চালু করেছিল, তার ফলে সেখানকার তালুকদারেরা কেবলমাত্র অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, নবাবি শাসনের যুগে তারা যে প্রতিপত্তি ও জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করত, তাও তারা হারিয়েছিল। ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, প্রতাপগড়, রায়বেরিলি, গোন্ডা, বাহ্‌রাইচ ইত্যাদি জেলায় নবাবি আমলে তালুকদারেরা শতকরা ৭৮টি গ্রামের সমস্ত জমির মালিক ছিল। ইংরেজ বন্দোবস্ত চালু হবার পর এই হার কমে হয়েছিল ৫০ শতাংশ। ১৮৫৮ সালের ১৯ এপ্রিল লন্ডনের কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ বা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে লিখিত একটি চিঠিতে জানিয়েছিল—অযোধ্যার নবাবকে অকস্মাৎ ক্ষমতাচ্যুত করা এবং নতুন ভূমিব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সেখানকার ভূস্বামীদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ফলেই অযোধ্যায় বিদ্রোহ একটি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল।

১৮৫৭ সালের ২৫ আগস্ট বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক প্রচারিত আজমগড় ঘোষণাপত্রে ইংরেজ শাসনের ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় জনসাধারণের হতাশা ও ক্ষোভ স্পষ্টই পরিস্ফুট হয়েছিল। এই ঘোষণাপত্র কেবলমাত্র ইংরেজ সরকারের মাত্রাতিরিক্ত ভূমিরাজস্ব চাহিদাকেই নিন্দা করেনি, ইংরেজ সরকার কর্তৃক অনুসৃত বাণিজ্যনীতি কীভাবে দেশীয় বণিক ও কারিগরদের ধ্বংস করেছিল সে বিষয়েরও উল্লেখ আজমগড় ঘোষণাপত্রে ছিল। দেশীয় শিল্পপণ্যের রপ্তানি কমিয়ে এবং ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যের আমদানি বাড়িয়ে ভারতের ইংরেজ সরকার ব্রিটিশ পণ্যে ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া ভারত থেকে রপ্তানিকৃত শিল্পপণ্যের ওপর গ্রেট ব্রিটেনের সরকার চড়া হারে আমদানি শুল্ক বসিয়েছিল এবং এখানকার কোম্পানি সরকার ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আমদানি শুল্কে প্রচুর ছাড় দিয়েছিল। ফলে ভারতীয় বণিকেরা এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় এবং ভারতীয় কারিগরদের তৈরি পণ্যের চাহিদা ক্রমশ লোপ পায়। এই অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ভারতীয় বণিক এবং কারিগরেরা ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে পড়ে এবং ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। দারিদ্র্যপীড়িত এইসব বণিকেরা ও কারিগরেরা তাই ইংরেজ-বিরোধী এই মহাবিদ্রোহে অংশ নিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

কেম্ব্রিজ ইতিহাসকার সি. এ. বেইলি (C. A. Bayly) তাঁর *The Indian Society and the Making of the British Empire* নামক সাম্প্রতিক গ্রন্থে বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তদানীন্তন ভারতের বেশকিছু 'প্রান্তিক গোষ্ঠী' (Marginal Communities)-র অসন্তোষের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভাট্টি রাজপুত, গুজর, পাশি, বাঞ্জারা প্রভৃতি পশুচারণকারী আধা-যাযাবর গোষ্ঠীর বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের সময় 'বিষম ভীতি' (great fear) যেমন রাজতান্ত্রিক

কর্তৃত্বকে সিপাহিরা খুব ঘৃণা করত। এই বিদ্রোহে সমাজের [illegible] এই প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির ব্যাপক [illegible] ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে [illegible] নিয়েছিল। বেইলির মতে—এই প্রান্তিক গোষ্ঠীর লোকেরাই প্রথম [illegible] ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল। [illegible] বেইলি মহাবিদ্রোহের মূল কারণ হিসাবে জনগণের অর্থনৈতিক অসন্তোষকে উল্লেখ করেননি, কিন্তু [illegible] না যে অসন্তুষ্ট দারিদ্র্যই উপরোক্ত প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির লোকেদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল। যমুনা নদীর তীরবর্তী রাজপুতেরা যেমন ভূমিরাজস্ব নীতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কোম্পানি সরকার কর্তৃক গৃহীত ভূমিব্যবস্থার জন্য বিদ্রোহে [illegible] ও ভাট্টিদের পশুচারণের জন্য রক্ষিত জমিগুলি হাত ছাড়া হবার [illegible] অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতেই এরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। [illegible] যে-কোনো অঞ্চলের বিদ্রোহের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে [illegible] দরিদ্র প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষেরা, যাদের সরকারের সরকারি নথিপত্রে 'অপরাধী গোষ্ঠী' (Criminal Tribes) হিসাবে আখ্যায়িত করা হত তারা বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। প্রায় সমসাময়িককালে সংগঠিত চীনের তাইপিং বিদ্রোহের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত চীন বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক জাঁ শ্যেনো (Jean Chesneaux) দেখিয়েছেন—ভবঘুরে, দেশত্যাগী, নিঃস্ব ভাগ্যবিড়ম্বিত দরিদ্র মানুষেরা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার কারণেই যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন এলাকার মানুষ ইংরেজ-বিরোধী হয়ে উঠেছিল এবং সরকার-বিরোধী এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল—ঐতিহাসিক শশীভূষণ চৌধুরীর এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা যায় না।

১০.২ মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি ও ধারা

বর্তমান অধ্যায়ের সূচনাতেই আমরা দেখেছি যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের স্বরূপ চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে সমসাময়িক ইংরেজ আমলা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক তীব্র বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। প্রথমে মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন মতামতগুলি আলোচনা করে বিদ্রোহের ধারার ওপর আলোকপাত করলে বিদ্রোহের স্বরূপ চরিত্র ধরা পড়বে। বিতর্কের সূত্রপাত ১৮৫৮ সালে। জে. বি. নর্টন (J. B. Norton) তাঁর *Topics for Indian Statesman*-এ প্রথম লিখেছিলেন—এটি একটি সামান্য সিপাহি বিদ্রোহ ছিল না, এই অভ্যুত্থান একটি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু অন্য এক সমসাময়িক ইংরেজ চার্লস রেইক্স (Charles Raikes) তাঁর *Notes on the Revolt in North Western Province of India*-তে বলেছিলেন—এটি ছিল একটি সিপাহি বিদ্রোহ। ব্রিটিশ কর্তৃত্ব শিথিল হবার ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ডাফ, কেয়, [illegible], ম্যালেসন অবশ্য নর্টনের বক্তব্যের সমর্থক এবং তাঁরা সকলেই ১৮৫৭ সালের এই বিদ্রোহে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার একটি সংগঠিত প্রয়াস দেখতে পেয়েছেন। পরবর্তীকালে বেশকিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক তথ্য সহকারে এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ

Scanned with CamScanner

করেছেন। আবার রেইকস উত্থাপিত দ্বিতীয় মতটির সমর্থকও প্রচুর। ১৮৭৮ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন—"এই বিদ্রোহ ছিল অবশ্যই কেবলমাত্র সিপাহিদের অভ্যুত্থান। এক লক্ষ সিপাহি এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন। এই অভ্যুত্থানে গণবিদ্রোহের ছিটেফোঁটাও ছিল না।" অন্য দুই সমসাময়িক ভারতীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির লেখাতেও একই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায়। গডসে ভাটজি নামে জনৈক মারাঠা পণ্ডিত যিনি বিদ্রোহের সময় উত্তর ভারত ভ্রমণ করছিলেন তিনিও একই কথা বলেছেন। কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহের শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই বিতর্ক চলেছে। পরবর্তীকালের প্রচুর ঐতিহাসিক তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও এই দ্বিতীয় মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্যার জন লরেন্স এবং সিলি এই বিদ্রোহকে "দেশদ্রোহী ও স্বার্থপর" (unpatriotic and selfish) সিপাহিদের বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে এই বিদ্রোহের পেছনে কোনো সংগঠিত নেতৃত্ব বা জনসমর্থন ছিল না। এল. ই. আর. রিস্ (L. E. R. Reese) এই বিদ্রোহকে ধর্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমানদের খ্রিস্টধর্ম বিরোধী জেহাদ হিসাবে দেখেছেন। ইংরেজ লেখক টি. আর. হোমসের মতে—এই বিদ্রোহে সভ্যতা বনাম বর্বরতার সংঘাত প্রকাশ পেয়েছিল।

আধুনিক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র মজুমদার জোরের সঙ্গে বলেছেন এটি ছিল একটি সিপাহি বিদ্রোহ মাত্র। এই অভ্যুত্থানকে কোনোমতেই জাতীয় যুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে না। তাঁর মতে—একদল সিপাহি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ভারতীয় জনসাধারণের অন্যান্য অংশের মানুষ এই বিদ্রোহে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তিনি আরও বলেছেন—ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনার তখন "ভ্রূণাবস্থা"। সুতরাং সেখানে কোনো জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে না। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেনও এই বিদ্রোহকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হিসাবে মেনে নিতে নারাজ। তিনি বলেছেন—সিপাহিদের অভ্যুত্থানের সুযোগে একদল হতাশ সামন্তপ্রভু নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তাঁর মতে বিদ্রোহের পেছনে কোনো জাতীয় নেতৃত্বের বা জাতীয় স্তরে কোনো পরিকল্পনার অস্তিত্ব ছিল না এবং অভ্যুত্থানগুলি হয়েছিল বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের অনেকেই কিন্তু এই মহাবিদ্রোহকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হিসাবে দেখেছেন। রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর *সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে সিপাহিরা জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়েই ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়েছিল। বীর সাভারকারও ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে একটি জাতীয় যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নিরূপণ করতে গিয়ে বিতর্কের উপর সম্পূর্ণ নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন ঐতিহাসিক শশীভূষণ চৌধুরী। তিনি তাঁর *Civil Rebellion in the Indian Mutinies* গ্রন্থে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় যুদ্ধ বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি এটিকে একটি গণবিদ্রোহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। ১৮৫৭-১৮৫৮ সাল জুড়ে সিপাহিদের বিদ্রোহ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে অসামরিক সাধারণ মানুষেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেদিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে ভারতের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং এই সংগ্রামের নেতারা "জাতীয়তাবাদের অচেতন যন্ত্র" (unconscious tool of Nationalism) হিসাবে কাজ করেছিলেন।

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক এরিক স্টোক্স অবশ্য এই বিদ্রোহে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একদল গ্রামীণ ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভু এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁদের অনুরাগী তাঁদের অনুসরণ করেছিল মাত্র। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এই বিদ্রোহে পরিলক্ষিত হয়নি। আর একজন কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক সি. এ. বেইলি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন—বিদ্রোহের সূচনাপর্ব থেকেই অসামরিক মানুষের বিদ্রোহ এবং সিপাহিদের অভ্যুত্থান একে অপরকে শক্তিশালী করেছিল (....... from its inception the civilion rebellion and the mutinies reinforced each other.)। কারিগর, বিক্ষুব্ধ পুলিশ, দিনমজুর প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে ওঠা শহরে জনতা যে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল—একথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বেইলি আবার অন্যত্র বলেছেন—"বিদ্রোহীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য কোনো সুসংবদ্ধ মতাদর্শ বা কর্মসূচি ছিল না। প্রথম থেকেই পুরাতন ব্যবস্থার প্রতিনিধিদের খুব বেশি প্রাধান্য ছিল। বিদ্রোহের ভিত্তি কোনোমতেই জাতীয়তাবাদ ছিল না কারণ প্রান্তিক অথবা অবক্ষয়গ্রস্ত এলাকাগুলি থেকেই দীর্ঘ প্রতিরোধ উঠে এসেছিল" (Ultimately no coherent ideology or programme existed to channelise the aspirations of the rebels .... There were too many representatives of the old order involved from the start. Nor did nationalism provide a basis since it was from the marginal or declining areas of Indian society the most prolonged resistance generally came.)।

এই মহাবিদ্রোহের প্রায় সমসাময়িককালে কার্ল মার্কস্ *New York Daily Tribune* পত্রিকায় এই অভ্যুত্থান সম্পর্কিত প্রবন্ধে এটিকে "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম" হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অথচ অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে মার্কসবাদী পণ্ডিত রজনী পাম দত্তের লেখায় রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও এরিক স্টোক্সের বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনিও এই বিদ্রোহকে ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ সামন্তপ্রভুদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে শেষ প্রতিক্রিয়াশীল প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বিশেষত তলমিজ খালদুন, সুপ্রকাশ রায় এবং প্রমোদ সেনগুপ্ত এই মহাবিদ্রোহকে ভারতীয় জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গৌরবময় সংগ্রামের কাহিনী হিসাবে দেখেছেন। তলমিজ খালদুন এই বিদ্রোহকে "দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কৃষক যুদ্ধ" (....... a peasant war against indigenous landlordism and foreign imperialism) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রমোদ সেনগুপ্ত তাঁর ভারতীয়

শাসন কায়েম করেন। শাসনকার্যে উচ্চপদে তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই নিযুক্ত করেছিলেন এবং রাজস্ব আদায় করেছিলেন। ম্যালেসন লিখেছেন—অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলগুলির অধিকাংশ মানুষই ব্রিটিশ বিরোধী উত্থানে অংশ নিয়েছিল। সাহারানপুরের সিপাহি ও সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে পুলিশ চৌকি ও সরকারি দপ্তর ধ্বংস করেছিল। রেল কোম্পানির সব কারখানা অগ্নিদগ্ধ হয়। অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরী দেখিয়েছেন—উত্তর ভারতের সাধারণ মানুষ যখন ব্রিটিশরাজের হাত থেকে ভারতীয় শিল্পকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিল, তখন জমিদার ও তালুকদারেরা সেই সুযোগে, যেসব বেনিয়াদের কাছ থেকে যারা নিলামে জমি কিনে জমির মালিক হয়ে বসেছিল, তাদের হাত থেকে জমি পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল। মথুরা, আগ্রা, আলিগড়, বান্দা প্রভৃতি এলাকার গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মহাজন, বেনিয়া ও পুলিশ থানা, আর শহরাঞ্চলে ইংরেজ কর্মচারী ও তাদের বাংলো এবং সরকারি দপ্তর ছিল বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।

একথা প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই মেনে নিয়েছেন যে অযোধ্যার গণবিদ্রোহ একটি সার্বিক রূপ নিয়েছিল। অযোধ্যার বিদ্রোহে বেগম হজরত মহল তাঁর নাবালক পুত্র নবাব বির্জিস কাদেরকে সামনে রেখে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে অযোধ্যার বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন সরকার গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোরক্ষপুরের মহম্মদ হাসান, সুলতানপুরের মেহেদি হাসান, শঙ্করপুরের বেনীমাধো, বীরবাহুর ইন্দ্রনারায়ণ ও মধুপ্রসাদ, দুরুয়ার দেবী বক্স সিং প্রমুখ। ১৮৫৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর কোম্পানি সরকার "ঘটনাপঞ্জীর বিবরণ" বা *Narrative of Events* নামে একটি দলিল প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছিল—"বিদ্রোহ একটি জনপ্রিয় চরিত্র গ্রহণ করার ফলে এবং কারা অধিক সংখ্যায় বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তা চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বলে, যে গ্রামগুলির মানুষ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল, ম্যাজিস্ট্রেটরা সে গ্রামগুলিকে সামগ্রিকভাবে পুড়িয়ে ফেলতে বা ধ্বংস করতে নির্দেশ দিয়েছিল" (In consequence of the general nature of the rebellion and the impossibility of identifying the majority of the rebels, magistrates recommended the wholesale burning and destruction of all villages proved to have been sent men to take active part of the revolt.)। হোমস স্বীকার করেছিলেন—অযোধ্যাতে ১,৫০,০০০ সশস্ত্র বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ৩৫,০০০ সিপাহি ছিল।

বিহারে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কুনওয়ার সিং নামে এক পতিত ও ক্ষমতাচ্যুত জমিদার। তিনি জগদীশপুর অঞ্চলে প্রায় ২০,০০০ সৈন্যের ছয় মাসের ভরণপোষণের সামগ্রী মজুত রেখেছিলেন এবং নিজ এলাকায় অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন। বিহারের গয়া জেলায় সাধারণ মানুষ হায়দর আলি খান এবং যুদ্ধর সিং-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যুদ্ধর সিং নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং সমস্ত গ্রামের জমিগুলি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। গয়ার সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত ওয়াজিরগঞ্জ অঞ্চলে কুশল সিং স্বাধীন রাজ্য

গড়ে তুলেছিলেন। ৩০ জুলাই থেকে ৪ আগস্টের মধ্যে রাঁচিতে, ছোটোনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগনায় সিপাহিদের উত্থান হয়েছিল। এটি এবং ছোটোনাগপুরে বিদ্রোহীরা সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করে ও বন্দিদের মুক্ত করে দেয়। সিংভূম ও পালামৌ অঞ্চলে সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে গণবিদ্রোহ যুক্ত হয়েছিল। এই অঞ্চলের বিদ্রোহ উপজাতীয় অভ্যুত্থান (tribal insurrection) এর রূপ নিয়েছিল। সিংভূমের কোলেরা অর্জুন সিং এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে তাদের নেতা ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত কোলেরা গেরিলা সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। পালামৌ অঞ্চলের চেরো এবং খেরোয়ারা দুই ভাই নীলাম্বর শাহি এবং পীতাম্বর শাহির নেতৃত্বে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সরকার বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। ওড়িশার সম্বলপুরে সুরেন্দ্র সাই এর নেতৃত্বে পরিচালিত গণসংগ্রাম ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল। সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—"সুরেন্দ্র সাই সম্বলপুর অঞ্চলে একটি সমান্তরাল সরকার গড়ে তুলেছেন এবং সমগ্র এলাকা এক বিপজ্জনক উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে।" এমনকি রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বীকার করেছেন—"এই পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে একটি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল" (The rebellion in these hilly regions was no doubt of a popular character.)।

বিদ্রোহের উত্তাল পাঞ্জাবকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। সরকার এখানে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে এবং পাঞ্জাবি ও হিন্দুস্থানিদের মধ্যে ঐতিহ্যগত শত্রুতাকে কাজে লাগিয়েছিল। তাছাড়া পাঞ্জাবের সরকার তেমন করে পাঞ্জাবের কৃষিব্যবস্থার সামাজিক কাঠামোয় পূর্ণ একটা পরিবর্তন আনেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারের বিদ্বেষ ও শাসননীতিকে উপেক্ষা করে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা অঞ্চলের শিখেরা হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল। ফিরোজপুর থেকে লুধিয়ানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে শতদ্রু নদীর দুই তীরে বিদ্রোহীরা বহু সংখ্যক ইংরেজ ও তাদের ভারতীয় সমর্থকদের হত্যা করেছিল। কার্নাল জেলার জাঠ অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে গণবিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই অভ্যুত্থানকে সামান্য সিপাহি বিদ্রোহ হিসাবে দেখাতে চাইলেও উপরে বিবৃত তথ্যসমূহ প্রমাণ করে যে এই বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে একটি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। হনওয়ান্ত সিং নামে অযোধ্যার কালাকাঙ্কর অঞ্চলের এক তালুকদার ইংরেজদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—"সাহেব, তোমাদের দেশের মানুষ আমাদের দেশে এসে আমাদের রাজাকে বিতাড়িত করেছে। একটি আদালতেই তোমরা আমার জমি নিয়ে নিয়েছ, যে জমি আমার পরিবারের পূর্বপুরুষেরা স্মরণকালের আগে থেকে ভোগ করে এসেছে। কিন্তু হঠাৎই তোমাদের ওপর চরম দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। এদেশের মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এখন তোমরা আমার কাছে এসেছ, যার সবকিছু তোমরাই লুণ্ঠন করেছিলে। কিন্তু এখন? এখন আমি আমার অনুগামীদের নেতৃত্ব দিয়ে লক্ষ্ণৌ যাব তোমাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য।" হনওয়ান্ত সিং যে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরাও সে সত্য অনুধাবন করতে পারেননি যে সিপাহিরাও এদেশের মানুষ ছিল। দিল্লির পতনের পর ইংরেজরা যখন সমস্ত শক্তি দিয়ে লক্ষ্ণৌ-এর ওপর মনঃসংযোগ করেছিল, তখন অযোধ্যার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে

সশস্ত্র কৃষকেরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লক্ষ্ণৌ-এ গিয়ে হাজির হয়েছিল। এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সি. বল (C. Ball) বলেছেন—"সমস্ত দেশের সশস্ত্র ভবঘুরের দল লক্ষ্ণৌ-এর দিকে ধেয়ে গিয়েছিল এবং ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে শেষ মহাসংগ্রামে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রতীক্ষা করেছিল" (The whole country was swarming with armed vagabonds hastening to Lucknow to meet their common doom and die in the last grand struggle with the Firangis.)।

১০.৩ নতুন রাষ্ট্র ও তার মতাদর্শ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক আলোচনার পর দেখা যেতে পারে বিদ্রোহীরা নিজেরা এই অভ্যুত্থানকে কী চোখে দেখেছিলেন এবং তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল? এ বিষয়ে সামান্য কিছু তথ্য ঐতিহাসিকেরা পেয়েছেন।

১৮৫৭ সালের ১১ মে সিপাহিরা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে 'শাহেনশা-ই-হিন্দ' বলে ঘোষণা করে। তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের ঐক্যের প্রতীক এবং সিপাহিদের সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। কিন্তু জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সেনাপতি বখ্‌ত খান যখন দিল্লিতে এসে উপস্থিত হলেন, বিদ্রোহীরা তখন এই নতুন রাষ্ট্রের কাঠামো ব্যাখ্যা করে একটি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। বাহাদুর শাহ্‌কে পুনরায় ভারতের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করা হল। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা রাখা হল "কোর্ট অফ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন"-এর হাতে। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ তাঁর বিচারের সময় স্বীকার করেছিলেন যে—এই "কোর্ট অফ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন"-ই প্রকৃত ক্ষমতার আধার ছিল এবং তিনি সবক্ষেত্রেই এই কোর্টের আজ্ঞাবহ ছিলেন। এই কোর্ট রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করত, বিভিন্ন এলাকা থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করত এবং নব-বিজিত রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিত।

এই কোর্টের দশজন সদস্য ছিলেন। এর মধ্যে ৬ জন সিপাহি ও ৪ জন অসামরিক ব্যক্তি। নতুন রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী তিনভাগে বিভক্ত ছিল—পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ। কোর্টের দশজন সদস্যের মধ্য থেকেই একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হতেন। সম্রাটের কোর্টের অধিবেশগুলিতে উপস্থিত থাকার পূর্ণ অধিকার ছিল। কোর্টের কোনো প্রস্তাব অনুমোদন করতে সম্রাট অস্বীকার করলে, কোর্ট তা পুনরায় বিবেচনা করত। তবে ঐতিহাসিক তলমিজ খালদুন বলেছেন—কোর্ট সর্বদাই নিজের ইচ্ছেমতো প্রস্তাবই গ্রহণ করত। কোর্টের দুধরনের অধিবেশন বসত। একটি সাধারণ অধিবেশন—যা প্রতিদিন লালকেল্লায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলত। আর একটি বিশেষ অধিবেশন। কোনো জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দিনের যে-কোন সময়েই এই বিশেষ অধিবেশন বসত। কোর্টের সদস্য যে ৬ জন সিপাহি ছিলেন তাঁরা রাষ্ট্রের সামরিক বিষয়ের ওপর নজর রাখতেন। বাকি ৪ জন অসামরিক ব্যক্তি প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালন করতেন। ১৮৫৭ সালের ৮ আগস্ট একটি পরোয়ানা জারি করে কোর্টের সদস্যদের দিল্লিতে একটি বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। এই অধিবেশনে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা ও সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ডাক-সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং মহাজনদের থেকে রাষ্ট্রের ঋণ গ্রহণ।

Scanned with CamScanner

ছিল যাদের কিছুই হারাবার ছিল না। তারা ছিল শাসিত, শাসক শ্রেণীর লোক নয়" (The rebels were for the most part men who had nothing to lose, the governed not the governing class.)। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ম্যাকলিওড ইনেস্ (Mcleod Innes)-এর স্থির বিশ্বাস ছিল যে ভূস্বামী অভিজাতরা নামেমাত্র বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। বরং বহু তালুকদার এবং অবস্থাপন্ন বণিক ইংরেজ সেনাদের রসদ জোগান দিয়েছিল এবং বিদ্রোহীদের ভয়ে পলাতক ইংরেজদের আশ্রয় দিয়েছিল।

বিদ্রোহীরা যে দিল্লির মসনদে বাহাদুর শাহ্‌কে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং একটি বিকল্প রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল—তার থেকে একটি কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। হয়তো এই পরিকল্পনায় ভ্রান্তি ছিল। কিন্তু তার থেকে, বিদ্রোহীদের আদৌ কোনো পরিকল্পিত প্রয়াস ছিল না, রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। তাছাড়া বিদ্রোহীরা অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও একটা প্রতিনিধিমূলক সরকার গড়ে তুলেছিল এবং এ ব্যাপারে তাদের কোনো পূর্ব ইতিহাস বা অভিজ্ঞতা ছিল না। সবথেকে বড়ো কথা—সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এই নতুন বিকল্প রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এই বিকল্প রাষ্ট্রগঠনের গুরুত্ব কম নয়। সামরিক ও অসামরিক দুধরনের বিদ্রোহীরাই ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে আন্তরিকভাবেই মুক্তি পেতে চেয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ২৭ জুলাই ডিস্‌রেলি ইংল্যান্ডের হাউস অফ্ কমন্সের অধিবেশনে বলেছিলেন—ভারতীয় বিদ্রোহ কখনোই একটি সিপাহিদের অভ্যুত্থান নয়, এটি একটি জাতীয় বিদ্রোহ এবং সিপাহিরা তার হাতিয়ার মাত্র।

১০.৪ বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি প্রতিবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং সেগুলি কোম্পানির শাসকদের যথেষ্ট বিব্রত করেছিল। কিন্তু ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক দিয়ে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ আগের সবগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল এবং এই অভ্যুত্থান ইংরেজ শাসকদের কাছে নজিরবিহীন বিপদসংকেত বহন করে এনেছিল। অল্প সময়ের জন্য হলেও বিদ্রোহীরা উত্তর ও মধ্য ভারতে ইংরেজ কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়েছিল। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নিজেও স্বীকার করেছিলেন—"মধ্য ভারত আমাদের হাতছাড়া হয়েছে এবং তাকে পুনর্বিজিত করতে হবে" (I look upon Central India as gone; and to be reconquered.)। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের এই ব্যর্থতার জন্য একাধিক কারণ দায়ী ছিল।

এইচ. টি. ল্যামব্রিক (H. T. Lambrick) বলেছেন—বিদ্রোহীদের সেনাবাহিনী ইউরোপীয় সেনাবাহিনী তথা রণকৌশলকে অন্ধভাবে অনুকরণ করত। এটি ছিল বিদ্রোহীদের অসম্ভব দুর্বলতা যা ইংরেজ বাহিনীকে রণক্ষেত্রে সুবিধাজনক ও অনুকূল পরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়েছিল। বিদ্রোহীরা প্রায়ই বিশাল বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হত। ফলে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য শত্রুদের কাছে অজানা থাকত না। উন্নতমানের রণকৌশল এবং সামরিক সরঞ্জামের বিরুদ্ধে এইভাবে সাফল্যলাভ করা যায় না। মোটামুটি সবক্ষেত্রেই বিদ্রোহীরা একই সামরিক কৌশল অবলম্বন করেছিল এবং তাদের রণনীতি নির্ধারণের

ব্যাপারে কোনো উদ্ভাবনী শক্তি বা নমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়নি। বিভিন্ন বিদ্রোহী সেনাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনে চলাফেরা করার প্রবণতা স্পষ্ট ছিল। ফলে ইংরেজ সেনার পক্ষে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করা অনেক সহজ হয়েছিল। বিদ্রোহী বাহিনী যদি নিজেদের দীর্ঘদিন ধরে দিল্লিতে আবদ্ধ করে না রেখে কলকাতা অভিমুখে অভিযান চালাত, তাহলে হয়তো ঘটনাবিন্যাস ভিন্নখাতে প্রবাহিত হত। যুদ্ধের এলাকা প্রশস্ত হত এবং তার ফলে ইংরেজ শাসকদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা কঠিন হত। বিদ্রোহী বনাম শাসকদের এই যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সুরক্ষিত নগরগুলিকে অবরোধ করা ও সেগুলির প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই কৌশল বিদ্রোহীরা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি। শৃঙ্খলা ও সমন্বিত প্রয়াসকে পুঁজি করে বিদ্রোহী সিপাহিরা অন্যান্য ভারতীয় সেনাদের অনায়াসেই পর্যুদস্ত করেছিল, কিন্তু যখনই তারা ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল, তখনই তারা বেসামাল হয়ে পড়ে। সিপাহিদের মধ্যে বহু যোগ্য সামরিক নেতা ছিলেন এবং তাঁরা চেষ্টা করলেই নতুন রণকৌশল উদ্ভাবন করতে পারতেন এবং গোটা বাহিনীকে ছোটো ছোটো লড়াকু গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে সেগুলির দায়িত্ব নিতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—তাঁরা তা করেননি। পরবর্তীকালের অনেক ইংরেজ সামরিক অফিসার সি. ই. কলওয়েল (C. E. Callwell) বলেছিলেন—বিদ্রোহী সিপাহিরা সাধারণত রাত্রিতে শত্রুপক্ষের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়নি এবং গেরিলা কৌশল অবলম্বন করেনি। এই বক্তব্যে কিছুটা সত্যতা আছে। একথা সত্য যে বিদ্রোহীরা কোনো কোনো এলাকায় গেরিলা কৌশল অবলম্বন করেছিল, কিন্তু এই ব্যাপক অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তার ভূমিকা ছিল নগণ্য। কুনওয়ার সিং, অমর সিং, তাঁতিয়া তোপি প্রমুখ নেতারা যখন যুদ্ধে গেরিলা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তখন ইংরেজ বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের অনেকেই ব্যক্তিগত সাহস ও আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো সুদক্ষ নেতৃত্ব বিদ্রোহীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেনি। যদিও সিপাহি এবং সাধারণ মানুষ সেইসময় বাহাদুর শাহ্‌কে সর্বোচ্চ নেতার মর্যাদা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু তারা সকলেই বাহাদুর শাহের দোলাচলচিত্ততা এবং অবিশ্বস্ত মনোভাব সম্পর্কে সচেতন ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিদ্রোহী সৈন্যদের একটি নির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করার মতো যোগ্যতা নানাসাহেব বা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর ছিল না। নানাসাহেব ইংরেজ সেনাপতি হ্যাভেলকের হাত থেকে কানপুর রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং সিপাহিদের দিল্লির পথে অগ্রসর হতে বারণ করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আসলে নানাসাহেব নিজের ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে এত বেশি চিন্তিত ছিলেন যে তাঁর অন্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর উৎসাহ বিশেষ ছিল না। রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর ওপর গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি তাঁর সামরিক কার্যাবলি একটি সংকীর্ণ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কুনওয়ার সিং, তাঁতিয়া তোপি, মৌলবী আহ্‌মাদুল্লাহ্, বখ্‌ত খান ও অন্যান্য সামরিক নেতার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ করা যেতে পারে। উপরোক্তদের অনেকেই রণক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্যলাভ করা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের সামরিক প্রয়াস আঞ্চলিকতার বাইরে বিস্তৃত করতে পারেননি। হেনরি লরেন্স সঠিকভাবেই মন্তব্য

করেছিলেন—"বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে একজনও দক্ষ ও কার্যকরী নেতা উঠে আসেননি। সুদক্ষ নেতৃত্ব পেলে তারা নিশ্চয়ই আমাদের পরাস্ত করত।" কিন্তু তা হয়নি। এ প্রসঙ্গে ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলসের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন—সিপাহিরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন একেবারেই নেতৃত্বহীন। তাছাড়া বিজ্ঞানসম্মত রণকৌশল তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেননি, যার অভাবে আধুনিক যুদ্ধে অসহায় হয়ে পড়তে হয় এবং একটি শহর রক্ষা করার ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয় (The sepoys, bravely as every individual man and company fought in most instances, were utterly without leadership ....; that they entirely lacked the scientific element without which an army is now-a-days helpless, and the defence of a town utterly hopeless.)। নানাসাহেব কানপুরে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কুনওয়ার সিং আরায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁতিয়া তোপি ঝাঁসির শক্তিশালী দুর্গ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা যখন দিল্লী অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন তারা হাজার হাজার বিদ্রোহী সেনাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে দিয়েছিল। অথচ ইংরেজ সেনাপতি নেইল ও হ্যাভেলকের দিল্লী অভিমুখে অগ্রগতি রোধ করার কাজে এই বিশাল সংখ্যক সেনাকে নিযুক্ত করা যেত। এই সামরিক ব্যর্থতাই ছিল বিদ্রোহীদের সামরিক কৌশল সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবের অনিবার্য পরিণতি।

মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও আরও কিছু কারণের কথা ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে—বিদ্রোহীদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ আগ্নেয় অস্ত্রের অভাব, জমিদার ও ধনী বণিকদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্য। ঐতিহাসিক মহলে এরকম একটা মত প্রচলিত আছে যে সমাজের ধনী ও বুদ্ধিজীবীদের এই বিদ্রোহের প্রতি বিরূপ মনোভাব বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। একথা সত্যি যে ধনীব্যক্তিদের সমর্থন পেলে বিদ্রোহীরা লাভবান হত, কারণ তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেলে তারা তাদের সংগ্রাম আরও দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন বা বিরোধিতা কোনোটিরই বাস্তব গুরুত্ব ছিল না। কারণ সামরিক বিষয় উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান বা ক্ষমতা কোনোটাই তদানীন্তন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ছিল না। আসলে প্রথম থেকেই এই বিদ্রোহ ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। একটি অভ্যুত্থানের সাফল্য নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর। এক, কৃষক ও কারিগরদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ ও সময়োপযোগী সামরিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের ক্ষমতার উত্তরণ। দুই, সুদক্ষ সামরিক নেতৃত্ব এবং তিন, একটি বিদ্রোহী যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক রণকৌশলের প্রয়োগ। এই তিনটি ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হয়েছিল এবং তার ফলে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসকেরা কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মহাবিদ্রোহের গুরুত্বকে খাটো করলে চলবে না। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ নিঃসন্দেহে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের ভিতে চরম আঘাত হেনেছিল। এই অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই ইংরেজরা ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে মহারানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এনেছিল।